বিজ্ঞান কথন

Indian Science News Association ESTD.-1935

কলকাতা, এপ্রিল ২২, ২০২৬, বুধবার, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

টলমল বসুন্ধারা

দূরদর্শন কলকাতার সন্ধ্যাবেলার খবরে দু দিনের দুটি দৃশ্য:

(প্রথম দিন): কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত এক'শ বছরে আবহাওয়ার পরিসংখ্যানের পর্যালোচনা করে অনুমান করা যায় যে আগামী শতকে আবহাওয়া আরও প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠবে। ঝড় বাদলের সংখ্যা বাড়বে অন্তত ৩০ শতাংশ হারে।

(দ্বিতীয় দিন) : হুগলী জেলার আলু চাষীরা রাস্তায় আলু ছড়িয়ে ফেলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কারণ, ক্ষেতের ফসল কালবৈশাখীর জমা জলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা দাম তো পাচ্ছেনই না, বোনার খরচও উঠছে না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এ দুটি খবরের যোগসূত্র কি? দুটিরই সরল এবং সহজতম উপপাদ্য এই যে আবহাওয়ার অনুপ্রাসে বৈপ্লবিক বৈকল্য ঘটছে। যা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সমস্ত হিসাব পত্র উল্টে দিচ্ছে। মাথা ঘামিয়েও কুল পাচ্ছেন না তাবড় তাবড় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কি করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করবেন? সমস্ত হিসেব তাঁদের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা হালে পানি পাচ্ছেন না। বিজ্ঞানীরা বলছেন আবহাওয়া পরিবর্তনের পিছনে অন্যতম কারণ, পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ কি একটি কারণেই দূষিত হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ বাসী প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে দুয়ারে নির্বাচন। বক্তৃতার ফুলঝুরি ফুটছে। স্লোগান কান ফাটিয়ে দিচ্ছে। আবার দেওয়াল দখলে পোষ্টার, ব্যানার, ফেষ্টুন ব্যবহারে রাজনৈতিক কর্মীরা পাগলপারা। পরিণতি, শব্দ দূষণ, শ্রাব্য দূষণ এবং দৃশ্য দূষণ।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রটি সাম্প্রতিক একটি সম্পাদকীয়তে অভিযোগ করেছে যে বাজি জনিত শব্দ মাত্রা নিয়ে যত বাক্য ব্যায়িত হয় নির্বাচনী শব্দ দূষণ নিয়ে তার সিকি ভাগও আলোচিত হয় না। অপর দিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক পুরনো প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে কোলাহল মুখর শহরগুলির তালিকায় কলকাতার স্থান একাদশ নম্বরে।

গাড়ি কি কম ব্যবহার হচ্ছে? নেতারা বিরাট বিরাট কনভয় নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন, রোড শো করছেন, তার জন্য পেট্রল, ডিজেল কি কম পুড়ছে? অগণিত মিছিলের জন্য রাস্তায় যান-জট হচ্ছে না? কেউ কি একবারও ভাবছেন এতে বাতাসে কতটা পরিমানে কার্বন ডাই অক্সাইড বা আরও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস জমা হচ্ছে?

অপর দিকে এক তরুণ সাংসদ লোকসভায় আবেগমথিত তথ্য সহকারে বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে দেশে গাড়ির সংখ্যা কি ভাবে বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র গত বছরেই আড়াই কোটির বেশি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ি কেনার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাস্তা সেই অনুপাতে সম্প্রসারণ হয়নি। বা হলেও তা যথেষ্ট নয়। ফলে বাড়ছে ট্রাফিক জ্যাম। বাড়ছে দুর্ঘটনা, মানুষের ভোগান্তি।

ওঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র কলকাতা মহান-গরীতেই বছরে যান-জটে আটকে স্টিয়ারিং-এর পিছনে স্থবির হয়ে থাকা মানুষ জনের মাথাপিছু অন্তত ১১০ ঘন্টা সময় নষ্ট হয়। দিল্লী, মুম্বাই, পুণে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই বা হায়দ্রাবাদ জাতীয় মেট্রো শহরগুলিতে এই পরিস্থিতি এক এক জায়গায় এক এক রকম। কেউই কারও থেকে কম নয়।

এতগুলো শ্রম ঘন্টা বিনষ্ট হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিষময় হয়ে উঠছে। প্রতিবছর শীত কালে বাতাসে বিষবাষ্পের পরিমানের দিক থেকে দিল্লী বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। আমাদের তিলোত্তমাও যে খুব একটা পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ আমরা গত বছরেই পেয়েছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সাংসদ খুবই সঙ্গত ভাবে একটি জাতীয় "রোড ডিকনজেসশন মিশন"-এর প্রস্তাব রেখেছেন যার মূল কাজ হওয়া উচিৎ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নীতি নির্ধারণ, যা রূপায়িত হলে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল প্রভাব পড়বে বলে ওঁর বিশ্বাস। নির্বাচনী আওতায় থাকা শহর কলকাতা থেকেও এরকম একটি দাবী কয়েকটি অসরকারি সংস্থাও তুলেছেন। বিজ্ঞ জন অবশ্য ব্যঙ্গ করে বলেন, কার কথা, কে শোনে?

এ তো গেল দেশের কথা। পরিধির বাইরে, প্রতিবেশী প্রাচ্যের থেকে প্রতীচ্যের আকাশটা অনেকদিন ধরেই লাল। না ধোঁয়ায় কালো? গোলাগুলি, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মাঝেই অনর্গল মৃত্যুর দামামা বেজে চলেছে। দাম্ভিক, আগ্রাসনে মত্ত বিশ্ব নেতৃত্বের এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ নিয়ে ভাবার সময় কই? রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ কল্যাণের ভাঁড়ারে ইতিমধ্যেই টান পড়েছে। তাহলে, প্যারিস চুক্তি? ও তো কাগজে কলমে!

দানবিক শক্তির পাশাপাশি আণবিক অস্ত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করার মত হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও কি দোড়গোড়ায়? সমস্যাক্লিষ্ট বর্তমান প্রজন্ম কি তাহলে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এই সুন্দর পৃথিবী কি শেষে রূপান্তরিত হবে এক মুঠো ছাইয়ে, যা ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহ বা চন্দ্র পৃষ্ঠের বাসিন্দারা দেখতে পাবে?

আবার একটা বসুন্ধরা দিবস এসে গিয়েছে। কয়েক দিন বাদেই পরিবেশ দিবস। এবার আপন-রা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এই দুটি বিশেষ দিনের তাৎপর্য গুটি কয়েক পাগল পরিবেশ প্রেমী ছাড়া কেউই আপনাদের আর বোঝাবেন না। নেতাদের সময় কোথায়? দুয়ারে ভোট! জিতে আসতে হবে না?

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@hotmail.com

অতি সঙ্কটে সুন্দরবন, সঙ্কটে কলকাতাও

দেবদূত ঘোষঠাকুর

বনের কথা, মনের কথা:

সামনে খোলা একটা কম্পিউটার। তাতে পর পর রাখা মানচিত্রে গাঢ় লাল, হালকা লাল, সবুজ রঙে চিহ্নিত কয়েকটা অঞ্চল। দীর্ঘদিন পর পর সময়ের ব্যবধানে সময়ের ব্যবধানে তৈরি করা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানচিত্র সেটা। শেষের দিকের মানচিত্রগুলোতে একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে গাঢ় লাল অংশ ক্রমশ কমছে। লালের মাঝখানে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া জায়গার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। মনে হচ্ছে একমাথা চুলের মাঝখানে যেন

একটা টাক। আর সেই টাক যেন ক্রমশ বাড়ছে।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের গায়েই রাজ্য বন দফতরের একটা অফিস আছে। সেখানে নতুন একটা দফতর খোলা হয়েছে। রিমোট সেন্সিং দফতর। উপগ্রহের সাহায্যে গোটা বিশ্বের বনভূমি, স্থলভূমি এবং জলভূমির চিত্র প্রতিনিয়ত ফুটে উঠছে সেখানে রাখা কম্পিউটারের পর্দায়।

কিন্তু ওই কম্পিউটারের সামনে বসে যাঁরা তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত তাঁদের সামনে খোলা শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র। মাউজ ব্যবহার করে কখনও বড় হয়ে ভেসে আসছে সুন্দরবনের মানচিত্র। কখনও চোখের সামনে হাজির ডুয়ার্স, ঝাড়খণ্ডের দলমার জঙ্গল। আর শুধু তাৎক্ষনিক চিত্রই নয়, পাওয়া যাচ্ছ ৪০-৫০ বছর বছর আগের চিত্রও।

বন দফতরের নতুন সেই বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন অতনু রাহা। বন ও বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যেযে ওঁর অবদান ভুলব কি করে? জঙ্গলে পশুপাখিদের বৈচিত্রের কোনও খবর এলে প্রথমে আমাকেই ফোন করতেন। অন্য কাগজের রিপোর্টাররা পরে ওঁকে এই পক্ষপাতিত্বের জন্যেযে চেপে ধরত। পরিষ্কার বলতেন, 'দেবদূত ছাড়া এত ভালোবাসা মিশিয়ে লিখবে কে?'

>>৭

'ভূবিজ্ঞানে নোবেল' পেলেন ভি. রামানাথন

মানস চক্রবর্তী

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ভেবেছেন ভূবিজ্ঞানে (Geosciences) কোনো নোবেল পুরস্কার নেই। তবে ১৯৮০ সাল থেকে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এবং ক্রাফোর্ড ফাউন্ডেশন (লুন্ড, সুইডেন) যৌথভাবে 'ক্রাফোর্ড পুরস্কার' (Crafoord Prize)-এর প্রবর্তন করেছে যা 'নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য' হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই পুরস্কারটি এমন কিছু বিজ্ঞান বিষয়ে আজীবন কৃতিত্বকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যা নোবেল পুরস্কারের আওতাভুক্ত নয়। যেমন গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান/ভূবিজ্ঞান, জী-ববিজ্ঞান (মূলত পরিবেশবিদ্যা-কেন্দ্রিক) এবং পলিআর্থ্রাইটিস। পুরস্কারের বিষয়গুলো প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়।

এই বছর (২০২৬) পুরস্কারটি পাচ্ছেন একজন ভারতীয়-আমেরিকান বীরভদ্রন রামানাথন (ছবি দেখুন)। তিনি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (সান দিয়েগো) অন্তর্গত স্ক্রিপস ইনস্টিটিউশন অফ ওশানোগ্রাফির বায়ুমণ্ডলীয় ও জলবায়ু বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক (এমেরিটাস)।

তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে "অ্যারোসল কণা এবং অন্যান্য জলবায়ু-দূষক কীভাবে বায়ুমণ্ডলের শক্তির ভারসাম্য ও সামগ্রিক পৃথিবী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ায় মৌলিক অবদান রাখার জন্য।"

এই পুরস্কারে ৮০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা (যা প্রায় ৯ লক্ষ মার্কিন ডলারের সমতুল্য) মূল্যের নগদ অর্থ এবং একটি স্বর্ণপদক

(ছবি দেখুন) দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের মে মাসে সুইডেনের রাজা বিজয়ীর

>>৩

বিজ্ঞান প্রচারের কাজ একদিনের নয়

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সায়েন্স কমিউনিকেটরর্স ফোরামের সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। দীর্ঘদিন সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। বেশ কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন নিজের পেশা থেকে। কিন্তু, বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে নেশা তা তিনি আজও ছাড়তে পারেননি। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিজ্ঞান প্রচারের কাজ করে চলেছেন। বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বিজ্ঞান কহনের মুখোমুখির দরবারে আজ আমাদের সঙ্গী অভিজিৎ বাবু।

এই বিজ্ঞান সম্প্রচারকের কথায় উঠে এল এক আন্দোলনের গল্প, যা কেবল তথ্য দেওয়া নয়, বরং মানুষের মান-সিকতা বদলানোর প্রয়াস।

সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাব। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান প্রদর্শনী, পত্রপত্রিকা এবং আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতো। সেই পরিবেশেই বড় হওয়া একদল তরুণের মধ্যে তৈরি হয় বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ। ১৯৮৫ সালে গড়ে ওঠে সায়েন্স

কমিউনিকেটরর্স ফোরাম, যা পরে আরও সংগঠিত রূপ পায়।

প্রথমদিকে কোনও পরিকাঠামো ছিল না, কলেজ স্ট্রিটের সিঁড়ি বা ছোট ঘরেই চলত আলোচনা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট: কুসংস্কার দূর করা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা। সায়েন্স কমিউনিকেটরর্স ফোরাম তৈরির আগে, ছাত্রাবস্থা থেকেই অভিজিৎ বাবু বিজ্ঞানকে ভালোবেসে তার প্রচারের কাজে নেমে পড়েন। এই কাজের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত আসে ১৯৮৪ সালের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর। সেই ঘটনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ কত ভয়াবহ হতে পারে, তা সামনে আসে এবং বিজ্ঞানচর্চাকে আরও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজ-নীয়তা স্পষ্ট হয়।

সায়েন্স কমিউনিকেটরর্স ফোরাম -এর অন্যতম বড় উদ্যোগ ছিল শিশুদের নিয়ে বিজ্ঞান শিবির। হাতে-কলমে পরীক্ষা, প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ এই সবের মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে "মেথড অফ সায়েন্স" শেখানোর চেষ্টা করা হতো। পরে ন্যাশনাল চিলড্রেন'স সায়েন্স কংগ্রেস-এর মধ্যে দিয়ে এই কাজকে আরও বিস্তৃত করা হয়। এখানে শিশুদের শেখানো হতো পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

তবে আজকের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগও কম নেই অভিজিৎ বাবুর। স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যায় সীমাবদ্ধ, ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানভীতি তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে উচ্চশিক্ষাতেও বেসিক সায়েন্স পড়ার আগ্রহ কমছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান নিয়ে খুব বেশি পড়তে চাইছে না। কলেজস্তরে পিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথম্যাটিকস পড়ুয়ার সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। এরকম চলতে থাকলে এরপর বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া দুস্কর হয়ে যাবে। অভিজিৎ বর্ধনের মতে, বিজ্ঞান

>>২

বিশ্ব ভুবন অন্ধকার: আমরা কোথায় যাই

আনন্দ চক্রবর্তী

এই বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য প্রাচ্যে যে সংঘাত শুরু হয়েছে যার একদিকে ইস্রায়েল ও আমেরিকা, আর অন্য দিকে ইরান, তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বে।

আমাদের প্রধান চিন্তা জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে, যার শিকার পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই, রাশিয়ার মতো কয়েকটি দেশ বাদ দিয়ে। কিন্তু এই যুদ্ধের অন্য একটি অত্যন্ত খারাপ ফলশ্রুতি নিয়ে আমরা বোধহয় বিশেষ ভাবছিনা।

দুই পক্ষই বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে, কেউ ধ্বংস করছে তেল পরিশোধনাগার, কারো লক্ষ্য অস্ত্রকারখানা, আবার কারও বা পরমাণু শক্তির ভাণ্ডার। বিভিন্ন বন্দর, পারস্য উপসাগর এবং হরমুজ প্রণালীতে জাহাজের উপরে বোমা এবং মাইন-এর আক্রমণ তো আছেই।

>>২

বিশ্ব উষ্ণায়নে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা

মুকুলিকা জানা চ্যাটার্জী

বিশ্ব বলতে আমরা এখানে বলছি পৃথিবীর কথা। এই পৃথিবীর কোথাও কোথাও খুব ঠান্ডা আবার কোথাও কোথাও খুবই গরম। কোথাও আবার তাপমাত্রা বেশ মনোরম। পৃথিবীর সব জায়গার তাপমাত্রার গড়ই হল পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা।

গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে গত এক'শ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যা থাকার কথা তার তুলনায় এখন প্রায় ১.৫

>>২

বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস ২০২৬: আমাদের গ্রহ, আমাদের শক্তি

বেবী সরদার

"আওয়ার প্ল্যানেট, আওয়ার পাওয়ার" (আমাদের গ্রহ, আমাদের শক্তি), যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিগত ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কোর সম্মেলনে প্রথমবার

>>২

Indian Science News Association ESTD.- 1935

INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION (ISNA)
92, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata – 700009

cordially invites you to a celebration of

EARTH DAY 2026

to be held on

WEDNESDAY, APRIL 22, 2026 AT 5.00 P.M.

in the N.R. Sen Auditorium
Rashbehari Siksha Prangan, University of Calcutta
92, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata – 700 009

PROF. ASHUTOSH GHOSH
Vice-Chancellor, University of Calcutta
will grace the occasion as the **CHIEF GUEST**

SHRI ASHOK SENGUPTA
Contributing Editor, Newscope
will grace the occasion as the **GUEST OF HONOUR**

PROF. BIKAS K. CHAKRABARTI
President, ISNA and
former Director, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata
will preside over the programme

Place: Kolkata
Dated: 16/04/2026

DR. AMIT KRISHNA DE
Honorary Secretary, ISNA

(Programme schedule attached)

বিজ্ঞান প্রচারের কাজ একদিনের নয়

পাতা ১ এর পর>>

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখাতে হলে বইয়ের বাইরে এসে হাতে-কলমে পদ্ধতির ওপর জোর দিতে হবে।

বিজ্ঞান প্রচারের পথে বড় বাধা হিসেবে তিনি দেখেন কুসংস্কার, ভাষার জটিলতা এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা। টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে যেখানে কুসংস্কার ও জ্যোতিষচর্চা গুরুত্ব পায়, সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় অনেকটাই উপেক্ষিত। তবে সমাজ মাধ্যম-কে তিনি সম্ভাবনাময় মাধ্যম হিসেবে দেখেন, যার মাধ্যমে দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব।

সবশেষে তাঁর বার্তা স্পষ্ট: বিজ্ঞান প্রচার কোনো একদিনের কাজ নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞান যোগাযোগকারীদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান প্রথমে নিজে বিজ্ঞানকে গভীরভাবে বুঝতে হবে, কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে, তারপর অন্যকে সচেতন করতে হবে।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার এই লড়াই তাই কেবল জ্ঞানের নয়, সমাজ বদলেরও।

বিশ্ব উষ্ণায়নে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা

পাতা ১ এর পর>>

মুকুলিকা জানা চ্যাটার্জী

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। এভাবে গড় তাপমাত্রা বা উষ্ণতার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে পৃথিবী আগের তুলনায় আরও বেশি উষ্ণ হয়ে উঠেছে। একেই বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ন।

কিন্তু কেন বাড়ছে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা? আর বাড়লে এমন কিই বা ক্ষতি হচ্ছে বা হবে?

মূলত বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির জন্যে। সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডল পেরিয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছলে, ভূপৃষ্ঠ সেই সৌরশক্তির বেশ কিছুটা পরিমান শোষণ করে তা ফেরত পাঠায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপশক্তি রূপে।

কিছুটা পৃথিবীর বাইরে চলে গেলেও, সেই তাপশক্তির বেশিরভাগটাই শোষণ করে নেয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু বিশেষ ধরণের গ্যাস। এই গ্যাসগুলি সেই তাপশক্তি শোষণ করে আবার তা ফেরত পাঠায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই।

ফলে, বেশ কিছু পরিমান তাপশক্তি ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোনোভাবেই চলে যেতে পারে না। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তেই থাকে। যে ধরণের গ্যাস এই তাপশক্তি ক্রমাগতই শোষণ এবং বিকিরণ করতে থাকে, সেগুলোই গ্রীনহাউস গ্যাস। এগুলোর মাত্রা অতিরিক্ত বাড়লেই ঘটে বিশ্ব উষ্ণায়ন।

মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ফ্লোরিনযুক্ত কিছু গ্যাস হল গ্রীনহাউস গ্যাসের অন্যতম উদাহরণ। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড। মূলত পৃথিবীব্যাপী মানুষের শিল্প এবং যান-বাহন সংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে অতিরিক্ত হারে বাড়তে থাকছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মত গ্রীনহাউস গ্যাসগুলি।

কয়লা, কাঠ, পেট্রোলিয়াম-জাত জ্বালানির বহুল ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশে। বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদজগতের দেহে কার্বন যৌগ রূপে থেকে যায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির সময়।

এদিকে পৃথিবীব্যাপী প্রতিনিয়ত বিশাল পরিমাণে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে চলেছে। এর ফলে সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনাঞ্চলের মৃত উদ্ভিদেরা বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর শোষণ করতে পারছে না, উপরন্তু, মৃত উদ্ভিদদের মধ্যে সঞ্চিত কার্বন যৌগ ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে মিশে চলেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে।

একবার বাতাসে মিশে যাওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড হাজার হাজার বছর ধরে থেকে যায় বাতাসে, কোনো না কোনো ভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে অবধি। তাই বিশ্ব উষ্ণায়নে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা অন্যতম।

দেখা গিয়েছে, বাতাসে নতুন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মেশা কমাতে পারে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বনাঞ্চল রক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের মত কর্মসূচীগুলি। কিছু দেশ বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেঁকে অন্য জায়গায় জমা রাখছে। এভাবে আমরাও চেষ্টা করতে পারি বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমানোর পুরোনো এবং নতুন নতুন উপায়।

বলা বাহুল্য, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বেড়েই চলেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের এবং অন্যান্য জায়গার হিমবাহের বরফ খুবই দ্রুত হারে গলছে। ফলে ক্রমশঃ বাড়ছে ঝড়ের এবং বন্যার প্রভাব। সমুদ্রের জলস্তরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেভাবে উষ্ণায়ন বাড়ছে সেভাবেই বাড়তে থাকলে আগামী এক'শ বছরে সমুদ্রতল প্রায় এক মিটার বেড়ে যাবে। ফলে ডুবে যাবে অনেক উপকূলীয় শহর। উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় হচ্ছে প্রচন্ড খরাও। কৃষিকাজ,পশুপালন, বসবাসের জায়গা সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হবে, এই খরা, ঝড়, বন্যার মত নানা প্রভাবে। বিপন্ন হচ্ছে এবং হবে প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎ।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাঁচতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সচেতনতা। এই সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সবরকমের প্রচেষ্টাকেই কার্যকরী করে তুলতে হবে। আমাদের নিজের নিজের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাই বিশ্ব উষ্ণায়নের এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের বাঁচতে সাহায্য করবে।

ছাত্রী, ৩৮তম অ্যাডভান্সড কোর্স, ইসনা

বিশ্ব ভুবন অন্ধকার: আমরা কোথায় যাই

পাতা ১ এর পর>>

আনন্দ চক্রবর্তী

ফলে যে ধুম্রজাল ঢেকে ফেলে শহরকে তাতে ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাধ্য হয় শহরবাসীকে জানাতে যে তারা যেন খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোন। কিছু নাগরিক ইতিমধ্যেই মাথাব্যথা এবং শ্বাস কষ্টের শিকার হয়েছেন।

ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Atmospheric Bio-geochemistry-র অধ্যাপক তড়হমনড় ঝযর বলেছেন, তেলের ধোঁয়াতে সূক্ষ কণা এবং অজৈব গ্যাস ছাড়াও রয়েছে আগুন লাগার ফলে সৃষ্ট বেশ কিছু বিষাক্ত জৈব উদ্বায়ী পদার্থ, যা নিশ্বাস-এর সঙ্গে শরীরে ঢুকে শ্বাসকষ্ট এবং হৃদরোগজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ লোকেদের জন্য।

সামরিক ঘাঁটি বা কারখানাতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বিষাক্ত প্রদূষণকারী সামগ্রী, যেমন ঞঘঞ, ভারী ধাতু এবং চখঅঝ (polyfluoroalkyl substances)ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে, জলে ও মাটিতে। চখঅঝ (উচ্চারণ P -FAS) কে বলা হয় 'forever chemicals,' কারণ এরা মাটিতে এবং মানব শরীরে থেকে যায় বহু দিন এবং ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার-এর মত মারণ রোগ।

পারস্য উপসাগরে ইরানের নৌবহরের উপরে আমেরিকা-ইস্রাইলি আক্রমণ এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলা জাহাজের উপর ইরানি বোমাবর্ষণের ফলে তেল ছড়িয়ে পড়ারও সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পারস্য উপসাগরের বিস্তৃত প্রবাল প্রাচীর এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের, যেমন সমুদ্রতৃণের মধ্যে বেঁচে থাকা মাছ, মুক্তো, ঝিনুক, সবুজ কচ্ছপ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উঁমড়হম দের পরিবার যারা এর মধ্যেই প্রায় অবলুপ্তির পথে। এদের আরও ক্ষতি করতে পারে এই ছড়িয়ে পড়া তেল। CEOBS এর বক্তব্য 'খুব কম সংঘর্ষতেই আমরা এই ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই ' .

আমাদের এখন ভাবতে হবে, আমরা এই আক্রমণের প্রতিযোগিতায় আমাদের সবুজ গ্রহকে কোথায় নিয়ে চলেছি?

প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ও পরিবেশবিদ

বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস ২০২৬: আমাদের গ্রহ, আমাদের শক্তি

পাতা ১ এর পর>>

বেবী সরদার

পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সুপারিশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে প্রথম বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস উদযাপিত হয়। সেই থেকে প্রতিবছর এই দিনটি মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে আসছে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন শিল্পায়ন, যানবাহনের ধোঁয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইডের মত গ্রীনহাউস গ্যাসগুলি ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

এই গ্যাসগুলি সূর্যের তাপকে আটকে রেখে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, এবং অস্বাভাবিক আবহাওয়ার ঘটনা যেমন ঘূর্ণিঝড়, খরা ও অতিবৃষ্টির প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বৃক্ষ ছেদনও পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

গাছপালা আমাদের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। অযথা বনভূমি ধ্বংসের ফলে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে , যা বিশ্ব উষ্ণায়নকে আরও ত্বরান্বিত করছে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস আমাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছোট ছোট পদক্ষেপ যেমন বেশি করে গাছ লাগানো, প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, শক্তির অপচয় রোধ করা, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো এই সবই পৃথিবীকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং, "আমাদের গ্রহ, আমাদের শক্তি" এই বার্তাকে হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের সকলের

উচিত পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া। পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান। একে রক্ষা করা আমাদেরই কর্তব্য।

ছাত্রী, ৩৮তম বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্স (অ্যাডভান্স) ইসনা

কেঁচো সারের বিকল্প নেই

বেবী সরদার

বর্তমান সময়ে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাভাবিক গঠন ও উর্বরতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
পাশাপাশি মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে , যেমন অ্যালার্জি, হজমজনিত সমস্যা ইত্যাদি।

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই কারণেই জৈব চাষ এবং বিশেষ করে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কেঁচো সার মূলত কেঁচোর সাহায্যে জৈব বর্জ্য পদার্থকে পচিয়ে তৈরি করা এক প্রাকৃতিক সার। এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেঁচো মাটির মধ্যে চলাচল করার সময় মাটিকে ঝুরঝুরে করে তোলে, ফলে মাটির বায়ু চলাচল ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কেঁচোর মল বা কাস্টিংয়ে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়ামসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক।

দীর্ঘদিন রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির উপকারী অণুজীব যেমন নাইট্রিফাইয়িং ব্যাকটেরিয়া যেমন রাইজোবিয়াম প্রভৃতির

সংখ্যা কমে যায়। কিন্তু কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে এই অণুজীবগুলির বংশবিস্তার ঘটে এবং মাটির জৈবিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার হয়। ফলে মাটি ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরে পায় এবং ফসল উৎপাদনও স্থিতিশীল হয়।

কেঁচো সার তৈরির প্রক্রিয়াও অত্যন্ত সহজ ও কম খরচসাপেক্ষ। প্রথমে মাটিতে একটি গর্ত তৈরি করে তাতে পলি বা শুকনো মাটি বিছিয়ে তার উপর সবজির খোসা, পচা পাতা, চায়ের পাতা, ডিমের খোসা ইত্যাদি জৈব বর্জ্য স্তরে স্তরে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে গোবর ও সামান্য মাটি যোগ করা হয়। এরপর সেখানে উপযুক্ত প্রজাতির কেঁচো ছেড়ে দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই বর্জ্য পদার্থ পচে উৎকৃষ্ট মানের কেঁচো সারে পরিণত হয়।

কেঁচো সারের একটি বড় সুবিধা হলো এতে কোনো রাসায়নিক উপাদান থাকে না, ফলে এটি পরিবেশ দূষণ ঘটায় না। এটির ব্যবহারে মাটির পি. এইচ. বা অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ফসলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে এটি মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে খরা বা বন্যার সময় মাটিকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে।

কেঁচো সারের জন্য ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেঁচো প্রজাতি হলো, আইসেনিয়া ফোয়েটিডা, লুম্ব্রিকাস রুবেলাস, পেরিওনিক্স এক্সফ্যাভোটাস, ইউড্রিলাস ইউজেনি ইত্যাদি। এই প্রজাতিগুলি দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং জৈব পদার্থ দ্রুত পচাতে সক্ষম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই কৃষি ব্যবস্থার জন্য কেঁচো সার একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি শুধু মাটির উর্বরতা বাড়ায় না, বরং পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্যও নিরাপদ।

তাই বলা যায়, বর্তমান সময়ে সুস্থ জীবন ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সত্যিই কেঁচো সারের কোনো বিকল্প নেই।

ছাত্রী, ৩৮ তম বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্স (অ্যাডভান্স), ইসনা

‘ভূবিজ্ঞানে নোবেল’ পেলেন ভি. রামানাথন

পাতা ১ এর পর>>

মানস চক্রবর্তী

এই পুরস্কার তুলে দেবেন। মজার ব্যাপার, এই পুরস্কার কয়েকজন বিজয়ীর ক্ষেত্রে ‘নোবেল পুরস্কারের অগ্রদূত’ হিসেবে কাজ করেছে।

স্বর্ণপদক (ক্রাফোর্ড পুরস্কার) বীরভদ্রন রামানাথন পোপ ফ্রান্সিসের সাথে রামানাথন ১৯৪৪ সালের ২৪শে নভেম্বর মাদুরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন, চেন্নাইতে বেড়ে ওঠেন এবং ১১ বছর বয়সে ব্যাঙ্গালোরে চলে যান। ১৯৬৫ সালে তিনি তামিলনাড়ুর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.ই. ডিগ্রি অর্জন করেন । পরবর্তী দুই বছর (১৯৬৫-১৯৬৭) তিনি ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত একটি রেফ্রিজারেটর প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর পর তিনি ব্যাঙ্গালোরের I.I.Sc. থেকে ১৯৭০ সালে এম.ই. ডিগ্রি অর্জন করেন।

সেই বছরেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান, নিউ ইয়র্কের স্টোনি ব্রুকের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক-এ রবার্ট সেস-এর তত্ত্বাবধানে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO2) গ্রীনহাউস প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৯৭৪ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

এর পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার নাসা ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টারে পোস্টডক্টরাল ফেলো হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেই সময় তিনি ১৯৭৪ সালে আবিষ্কৃত CFCs-এর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তর ধ্বংসের ভূমিকার কথা জানতে পারেন। সেই সময়ে গবেষণা করে রামানাথন আবিষ্কার করেন যে এই

CFC-গুলোরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রীনহাউস প্রভাব রয়েছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO2) প্রভাবের তুলনায় ১০,০০০ গুণেরও বেশি শক্তিশালী।

এই ফলাফল ১৯৭৫ সালে ‘সায়েন্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৮৫ সালে রামানাথন এছাড়াও আবিষ্কার করেন যে CO2 ছাড়াও অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস যেমন মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ইত্যাদি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তার এই গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯৮৭ সালে ‘মন্ট্রিল প্রোটোকল’ গৃহীত হয়। এই অসামান্য গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ রামানাথনকে ২০০৯ সালে ‘টাইলার পুরস্কার’(Tyler Prize) প্রদান করা হয়, যা ‘পরিবেশ গবেষণায় নোবেল পুরস্কার’ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এছাড়াও তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ওপর দিয়ে ভেসে চলা ‘বায়ুমণ্ডলীয় বাদামী মেঘ’ যে পৃথিবীর ওপর এক শীতলকারী প্রভাব বিস্তার করে, এবং জলীয় বাষ্প CO2-এর উষ্ণায়নকারী প্রভাবকে কীভাবে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে তা ব্যাখ্যা করেছেন। রামানাথন ‘প্রজেক্ট সূর্য (২০০৭)-এর আওতায়ও কাজ করেছেন, যার লক্ষ্য হল ভারতের গ্রামাঞ্চলে সৌর-চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুদূষণ ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস করা।

অধ্যাপক রামানাথন বহু সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন ও দেশি এবং বিদেশি বহু বিজ্ঞান একাডেমির ফেলো বা সদস্য হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

প্রাক্তন এমেরিটাস অধ্যাপক, বোস ইনস্টিটিউট, এবং সহ-সভাপতি, ইসনা

মানবশরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক

পল্লবী হালদার

একদিন সমুদ্র বলতে আমরা বুঝতাম বিশালাকার অনন্ত জলরাশির শুভ্রফেনিল ঢেউয়ের গর্জনে অফুরান প্রাণের প্রকাশ, বাতাস বলতে বুঝতাম জীবনের অপরিহার্য সর্বব্যাপী উপাদান যা আমাদের শ্বাসকার্য-যোগ-সংযোগ-যোগাযোগ-জ্ঞান-জীবনের গভীর রূপক। আর খাদ্য ও পানীয় ছিল জীবনের চালক। কিন্তু আজ জল-বায়ু-খাদ্য সবটাই হয়ে উঠেছে বিষময়। আজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে আসে প্লাস্টিকের বর্জ্য । বাতাসে ভাসে আণুবীক্ষণিক প্লাস্টিক কণা, খাদ্যেও আজ বিষাক্ত ছোট ছোট প্লাস্টিক দূষক।

কি নাম এই প্লাস্টিক কণার? ৫মি.মি.-১এন.এম.এর এই প্লাস্টিক কণার নাম মাইক্রোপ্লাস্টিক। শুনতে ‘মাইক্রো’ হলেও এর দাপট কিন্তু মাইক্রো নয়, বরং মানব শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাবের কথা বললে দেখা যাবে এটি একটি নীরব ঘাতক ছাড়া আর কিছু নয়। কি ভাবে পরিবেশে আসে এই কণা?

দুভাবে উৎপন্ন হয় মাইক্রোপ্লাস্টিক। প্রাথমিকভাবে ও গৌণভাবে। আমাদের ব্যবহৃত প্রসাধনী যেমন: ফেসওয়াশ, শাওয়ার জেল, স্ক্রাবার ইত্যাদির মধ্যে ব্যবহৃত মাইক্রোবিড্স। এছাড়াও, নার্ডল্স, পেলেট, সিন্থেটিক কাপড়ে থাকা মাইক্রোফাইবার ইত্যাদি মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রাথমিক উৎস। বড় প্লাস্টিক যান্ত্রিক উপায়ে, যেমন ঢেউয়ের আঘাতে, বায়ুপ্রবাহের ফলে, ভেঙে গিয়ে তৈরি করে মাইক্রোপ্লাস্টিক যা হল গৌণ উৎস।

মাইক্রোপ্লাস্টিক স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই বিরাজমান অথচ তাকে দেখার জন্য সাহায্য নিতে হয় FTIR, SEM এর মত কিছু বহু মূল্যবান পদ্ধতির। এই ক্ষুদ্র কণা খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে বায়োঅ্যাকুমুলেশ্যন তথা জৈববিবর্ধনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে নষ্ট করে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে। কথা হলো মাইক্রোপ্লাস্টিক কিভাবে মানব শরীরে প্রবেশ করে? তিনটি পথে প্রবেশ করে। মুখ, নাক ও ত্বকীয় মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয়, শ্বাস বায়ু, প্রসাধনী, সিন্থেটিক কাপড় ইত্যাদিতে উপস্থিত মাইক্রোপ্লাস্টিক মানব শরীরে প্রবেশ করে।

মানব শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রত্যেকটি তন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। যেমন, স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটারের বাধা সৃষ্টি করে, ব্রেইনে এর উপস্থিতি মস্তিষ্কের কোষগুলির কার্যকারিতায় বাধা প্রদান করে। ক্যারোটিড ধমনীতে প্রবেশ করে মাইক্রোপ্লাস্টিক হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়, প্রশ্বাসের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট মাইক্রোপ্লাস্টিক ফুসফুসের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ঘটায়। শ্বাসকষ্ট, হাঁচি, কাশি, রক্তে অক্সিজেন সংযুক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতিতে উৎসেচকের কাজে বিঘ্ন ঘটার ফলে পরিপাক সমস্যা দেখা দেয়।

উল্লেখ্য, প্লাস্টিকে উপস্থিত Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) মানব শরীরে অন্তঃক্ষরা তন্ত্রে বিভিন্ন

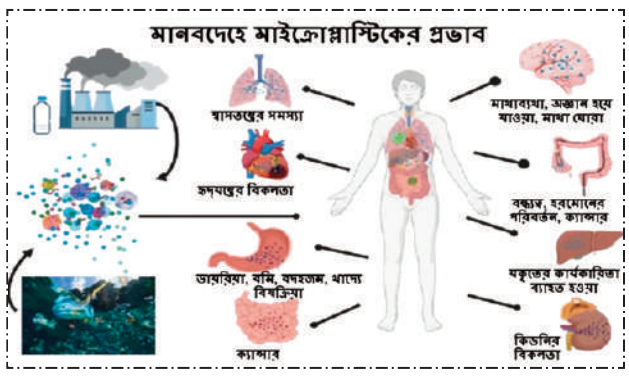

হরমোনের ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। EDCs'এর সাথে ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন, থাইরক্সিন হরমোনের গঠনগত সাদৃশ্য থাকায় মানব শরীরে উপরোক্ত হরমোনগুলির কার্যকারিতা নষ্ট করে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সেটি হল প্লাস্টিক নন-বায়োডিগ্রেডেবল অর্থাৎ বিয়োজিত হয় না। হলেও খুব বিরল ও বহু বছর পর। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি দ্বারা খবধপয-রহম পদ্ধতিতে প্লাস্টিক তথা মাইক্রোপ্লাস্টিক থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন কারসিনোজেনস যেমন : BPA, PAH ইত্যাদি। গরম খাদ্য ও পানীয় প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে বা প্লাস্টিকের পাত্রে খাদ্য, পানীয় মাইক্রোওয়েভে গরম করে খেলেও এই ঘটনা ঘটে।

প্রশ্ন হলো আর কত দিন? মাইক্রোপ্লাস্টিকের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি? তা হলে কি মাইক্রোপ্লাস্টিকের সাগরেই ডুবতে চলেছে মানুষের ভবিষ্যৎ? উত্তর হল ‘সচেতনতা’, যা মাইক্রো প্লাস্টিকের আক্রমণ থেকে বাঁচার মূল চাবিকাঠি। খুব সস্তা, সহজলভ্য, ব্যবহারও সহজ হওয়ার কারণে প্লাস্টিক খুবই জনপ্রিয় ঠিকই, তবে পরিবেশ ও নিজেদের জীবন রক্ষার্থে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মাইক্রো প্লাস্টিকের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোই হবে প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, প্লাস্টিকের পাত্র বিশেষত ঘষে যাওয়া প্লাস্টিক, প্লাস্টিক মোড়ক, সিন্থেটিক কাপড় ইত্যাদির বদলে ধাতু, কাঁচের পাত্র, সুতির বস্ত্র ব্যবহার, মাইক্রোবিড্স দেওয়া প্রসাধনীর ব্যবহার কমানো, সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলা, মাইক্রোওভেনে প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার ও পানীয় গরম না করা, Air purifier দ্বারা বাতাসকে পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিক অভ্যাসই মাইক্রোপ্লাস্টিক নামক নীরব ঘাতককে একদিন বিদায় দিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পরিবেশে এখনও অবধি উপস্থিত প্লাস্টিককে 3R (Reduce, Recycle, Reuse) নিয়মে ব্যবহার করাই শ্রেয়। তাহলে, আগামী দিনে আমরা মাইক্রোপ্লাস্টিক ভরা পৃথিবীতে বাস করব না কি মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণকে রোধ করব সেই প্রশ্নটা সৃষ্টি করেছি যেমন আমরা, উত্তরটাও কেবল তৈরী করতে পারি আমরাই।

আজ থেকেই হোক না শুরু?

ছাত্রী, ৩৮তম বিজ্ঞান সাংবাদিকতা (অ্যাডভান্সড) কোর্স, ইসনা

গ্রহাণু সংঘাত - এক মহাজাগতিক বিপর্যয়

পরমা তাপসী মাইতি

গ্রহাণু আসলে কী?

গ্রহাণু বা অ্যাসটেরয়েড হল পাথর,কাদা, বালি, ধাতব পদার্থ বা বরফে তৈরি গ্রহের তুলনায় অনেক ছোট মহাজাগতিক পদার্থ বিশেষ । আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে সৌরজগৎ সৃষ্টি হওয়ার সময় গ্যাস, ধূলিকণার মতো গ্রহ তৈরির যেসব উপাদানগুলো জমাট বেঁধে গ্রহ তৈরি করতে পারেনি তারাই সৌরজগতের বিভিন্ন স্থানে গ্রহাণু হিসাবে রয়ে গেছে।

গ্রহাণুদের ঘনত্ব সৌরজগতের সর্বত্র এক রকম নয় ।বৃহস্পতি আর মঙ্গলের মাঝখানে টরয়েড আকৃতির একটা বড় অঞ্চলে সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গ্রহাণু রয়েছে। যেটা গ্রহাণুপুঞ্জ নামে পরিচিত। বৃহস্পতির কক্ষ পথেও রয়েছে বেশ কিছু গ্রহাণু। বাকি গ্রহাণুও সৌরজগতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে।

গ্রহাণুগুলির আকার ২ মি ব্যাসার্ধ থেকে ৯৫০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। তবে এরা সবাই গোলাকৃতির নয়। তুলনামূলকভাবে বড়গুলো গোলাকার। ছোট গুলো অধিকাংশই এবড়ো থেবড়ো, নানা ধরনের অসম আকৃতির । এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিরিস(ব্যাস -৯৫০ কিমি)।

NEO কোন গুলো?

NEO কোন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১ অট (Astrsnonical Unit). এর মধ্যে যে সমস্ত Asteroid ও ধূমকেতুরা সূর্য থেকে ১.৩ অট দূরত্বে বা তার চেয়ে কম দূরত্বে রয়েছে তাদের বলা হয় NEO (Near Earth Object)|

আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ Near Earth Asteroid বা NEA আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে যখন এরা পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে, তখন তারা পৃথিবীর আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

NEO সৃষ্টির হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে ।যেমন মূল গ্রহ-াণুপুঞ্জের গ্রহাণুদের মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত। এর ফলে তারা ছিটকে তারা পৃথিবীর দিকে চলে আসে।

বৃহস্পতির তীব্র মহাকর্ষ বল কোটি কোটি বছর ধরে একটু একটু করে এদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করে।

আর একটা কারণ হলো সূর্যের আলোয় কোনো গ্রহাণুর অসম উত্তাপ হওয়া,যা গ্রহাণুগুলিকে তাদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে, যাকে বলা হয় ইয়ারকসভি এফেক্ট।

কেন NEO মানব সভ্যতার ভয়ের কারণ?

প্রথমতঃ আকারে ছোট হলেও গতিবেগ খুব বেশি হওয়ায় এদের গতিশক্তি খুব বেশি। গতিশক্তি হিসাব করার যে সূত্র- গতিশক্তি=১/২দ্ধ ভরদ্ধ (গতিবেগ) ২ আমরা জানি ,তার থেকে হিসাব করে বলা যায় একটা ছোট গ্রহাণুর শক্তি একটা ছোটখাটো পারমাণবিক শক্তির অস্ত্রাগারের সমতুল্য হতে পারে।

NEOরা যখন পৃথিবীর দিকে ছুটে আছে বিশেষ করে সূর্যের দিক থেকে, তখন সূর্যের তীব্র আলোর জন্য টেলিস্কোপে অনেক সময় তাদের দেখা যায় না ।দেখা যায় যখন একেবারে মাথার উপর এসে পৌঁছায়। একটা ছোট, মাত্র এক কিলোমিটার চওড়া, গ্রহাণুর সংঘাত বিশ্বের জলবায়ুতে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক প্রাণীর অব-লুপ্তিও ঘটাতে পারে।

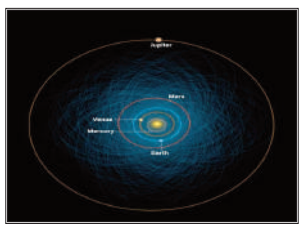

পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটি গ্রহাণু সংঘাতের ঘটনা।

আজ থেকে প্রায় ৬৬০লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে একটা বড়সড় গ্রহাণু সংঘাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে আছড়ে পড়া এই গ্রহ-াণুটি ছিল মাত্র ১০ থেকে ১৫কিমি চওড়া। এই সংঘাতে ডাইনোসরসহ পৃথিবীর ৭৫% প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যায়।

গত ২০০৮ সালে ৩০ শে জুন রাশিয়ার সাইবেরিয়ার দুর্গম অঞ্চলে তুসুঙ্গা নদীর কাছে, পৃথিবী থেকে পাঁচ থেকে দশ কিমি উচ্চতায় একটা ৫০ মিটার দীর্ঘ অ্যাসটেরয়েডের আঘাতে ২১৫০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে প্রায় ৮ কোটি গাছ পুড়ে গিয়েছিল। এর শক্তি ছিল জাপানের হিরোশিমায় আছড়ে পড়া পরমাণু বোমার শক্তির ১০০০ গুণ বেশি।

২০১৩ সালে রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্ক-এ যে কুড়ি মিটার দীর্ঘ ঘউঙ আছড়ে পড়ে সেটি হিরোশিমার বোমার প্রায় ৩০ গুন শক্তি সম্পন্ন । এতে প্রায় ১৪০০ মানুষ আহত হয়েছিল।

গ্রহাণুর সংঘাতে নানা রকমের তাৎক্ষণিক প্রভাব দেখা যায় যেমনঃ

১) তীব্র তাপপ্রবাহে তখনই একটা পুরো মহাদেশে আগুন ধরে যেতে পারে।

২) সংঘাতের স্থান থেকে বহু দূর পর্যন্ত এর প্রভাব থাকতে পারে। এর ফলে বড়সড় নগর ধূলিসাৎ হতে পারে।

৩) সমুদ্রে গ্রহাণু এসে পড়লে, বড় ধরনের সুনামির তৈরি হওয়ার কয়েকশো ফুট উঁচু ঢেউ উপকূল-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবিয়ে দিতে পারে।

এই সংঘাতের সুদূরপ্রসারী ফলও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। সংঘাতে সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ পাথরের টুকরো, ধুলো, ধোঁয়া পৃথিবীকে ঢেকে দিতে পারে। সেই ধোঁয়ার আস্তরণ ভেদ করে সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারে না। ফলে পৃথিবীতে বেশ কিছুদিনের মধ্যে তীব্র শীত অনুভব হয়। সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়, খাদ্যশৃংখল ভেঙে গিয়ে বহু প্রাণী অবলুপ্ত হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। এই অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। বর্তমানে গ্রহ- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কিছু টেলিস্কোপ- এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বদা নজরদারি চলছে।

পৃথিবীর কাছে চলে আসতে পারে এমন গ্রহগুলিকে সনাক্ত করা, তাদের গতিবিধি অনুসরণ করা, এমনকি প্রয়োজনে প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে। বেশ কিছু চেষ্টা সফলও হয়েছে। আমরা তাই বিশ্বাস রাখব যে বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা আমরা আমাদের গ্রহকে গ্রহাণু ও সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

ছাত্রী, ৩৮তম বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্স(অ্যাডভান্সড), ইসনা

আয়ুর্বেদ সম্পর্কে দু'চার কথা

দেবপ্রসাদ ঘোষদস্তিদার

আয়ুর্বেদ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অতি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিও হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই বিদ্যার বিকাশ হয়েছে ও তবে আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানদন্ড হল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষাগার-ভিত্তিক প্রমাণ এবং ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও তাই আয়ুর্বেদকে বিশ্বমানের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিতে ইতিমধ্যেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ও

বর্তমানে নেয়া পদক্ষেপ :

১) সরকারি উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান গঠন - ভারত সরকার আয়ুর্বেদ যোগ ইউন-ানী, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথির উন্নয়নের জন্য আয়ুষ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে ও এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে গবেষণা, শিক্ষা, ও চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে ও

২) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কাউন্সিল- আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সাইন্সেস (CCRAS)-সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে ও এইসব প্রতিষ্ঠান ভেষজ ঔষধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিয়ে গবেষণা করছে ও

৩) আধুনিক পরীক্ষাগার ও ফার্মাকোলজিক্যাল গবেষণা- ভেষজ ওষুধের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ টক্সিসিটি পরীক্ষা এবং কার্যকারিতা

যাচাই করার জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরীতে গবেষণা চলছে ও

৪) ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও প্রমাণ ভিত্তিক চিকিৎসা- অনেক আয়ুর্বেদিক ওষুধের ওপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হচ্ছে যাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানদন্ডে তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করা যায় ও

৫) শিক্ষা ও পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ-ইঅগঝ সহ আয়ুর্বেদিক শিক্ষায় আধুনিক এনাটমি, ফিজিওলজি,প্যাথলজি এবং গবেষণার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেও

৬) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রচার: ডঐঙ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়ুর্বেদের মান নির্ধারণ, নর ওষুধের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের চেষ্টা চলছে ও

ভবিষ্যতে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিত:

১) আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা- ভেষজ ওষুধের কার্যকারিতা, ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বড় আকারের multi-center clinical trials করা দরকার ও

২) স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল- ভেষজ ওষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত প্রণালী এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কঠোর মানদন্ড তৈরি করা প্রয়োজন।

৩) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার- বায়োটেকনোলজি, জেনোমিক্স, ডেটা সায়েন্স ও অও ব্যবহার করে ভেষজ উপাদানের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৪) সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা- আধুনিক চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদের মধ্যে সমন্বয়ে ঘটিয়ে রোগ নিরাময়ের নতুন মডেল তৈরি করা যেতে পারে

৫) ভেষজ সম্পদের সংরক্ষণ ও চাষ- অনেক ঔষধি গাছ বিলুপ্তির পথে সেগুলির সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস জরুরী

৬) আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রকাশনা- উচ্চমানের আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা পত্র প্রকাশ করলে আয়ুর্বেদের গ্রহণযোগ্যতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

সবশেষে বলতে হয় আয়ুর্বেদ শুধু ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি নয়। এটি প্রাকৃতিক চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভান্ডার ও যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করলে আয়ুর্বেদ ভবিষ্যতে বিশ্বস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেও

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন আধিকারিক, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রোবট ভাবতে শিখে গিয়েছে

ঋতবান মুখার্জি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন রোবটগুলিকে যেন "মস্তিষ্ক" জোগাচ্ছে, যার ফলে তারা নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে, শিখতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে। যেমন একটি শিশু তার বাবা-মায়ের কাজ দেখে শেখে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ায়, তেমনই আজকের এআই-চালিত রোবটগুলি ডেটা সংগ্রহ করে, প্যাটার্ন চিনে, এবং প্রতিটি কাজের সঙ্গে নিজেদের পারফরম্যান্স উন্নত করছে ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গাড়ি কারখানায় এই রোবটগুলি গাড়ি একত্রিত করছে আগের চেয়ে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে, ভুলভ্রান্তি কমিয়ে উৎপাদন আরও গতিময় করছে। মুদি দোকানগুলোতে এমন কিছু রোবট আছে, যারা জিনিসের তাকগুলো গোছাচ্ছে এবং দ্রব্যাদি দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। এমনকি, ডেলিভারি ড্রোনগুলোও ব্যস্ত আকাশে দক্ষ পাইলটের মতই চলাচল করছে।

এটি এমন, যেন এক সময়ের সীমিত ক্ষমতার "ঘুরিয়ে চালানো" খেলনাগুলিকে উন্নত করা হয়েছে, যাতে তারা এখন অনেক ধরণের কাজ সামলাতে পারে। সাধারণ অটোমেশন থেকে সত্যিকারের এআই-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই লাফ অগণিত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। রোবটরা আর শুধু পূর্ব-নির্ধারিত নির্দেশনা মেনে চলে না; তারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাস্তব সময়ে সেরা প্রতিক্রিয়া নির্বাচন করতে পারে। এর ফলে মেডিকেল সার্জারি থেকে দুর্যোগে উদ্ধারকর্মী হিসেবে কাজ করার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও তারা অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর রোবটিকসের মিশেলে আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে যন্ত্রগুলো সত্যিকারের "চলন্ত-চিন্তন" ক্ষমতা অর্জন করছে। তারা হয়তো মানুষের মত আত্মসচেতন নয়, কিন্তু তাদের শেখার ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা চমকে দেওয়ার মত। এই বিপ্লব শিল্পকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করবে, উৎপাদনশীলতা বাড়াবে, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাজের পদ্ধতির সূচনা করবে। সংক্ষেপে, রোবট আর কেবল চকচকে যন্ত্র নয়; তারা এখন সহকর্মী ও সহযোদ্ধা অভিজ্ঞতা থেকে শিখে ক্রমাগত উন্নতি করেআমাদের সামর্থ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে এবং সীমাবদ্ধতা কমাতে সহায়তা করছে।

বর্তমানের এক ঝলক

আপনার রান্নাঘরে ঢুকলে হয়তো দেখবেন একটি ছোট্ট রোবটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছুটোছুটি করছে, সারা বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য যেন একটি একনিষ্ঠ কর্মী। এআই-চালিত রোবট এখন আর শুধু বিশাল কারখানাতেই আটকে নেই, তারা ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মিশে যাচ্ছে। এই বুদ্ধিমান যন্ত্রগুলি আমাদের যান্ত্রিক বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, যা সাচ্ছন্দ্য, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা দিচ্ছে।

ভাবুন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আপনার কথা শুনে যন্ত্রমানবের মত সাড়া দিচ্ছে, থার্মোস্ট্যাট সামঞ্জস্য করছে বা গ্রোসারির তালিকা বানাচ্ছে। এগুলো এক ধরনের "অদৃশ্য রোবট," যা জটিল অ্যালগরিদমের ওপর ভিত্তি করে চলে। গুদামঘরে, স্মার্ট রোবটগুলো বাক্স সাজাচ্ছে আর পণ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে, যেন একদল মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছে। শুনতে জাদুর মত লাগলেও, এগুলোই আসলে এআই-এর বাস্তব ব্যবহার যা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করছে।

স্বয়ংক্রিয় লন-মোয়ারের মতো রোবট আপনার বাড়ির উঠানকে দক্ষ মালির মত সাজিয়ে দিচ্ছে, আবার রোবট শেফ রেস্তোরাঁ-মানের খাবার প্রস্তুত করছে। এছাড়া যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, উদ্ধার রোবট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, যেভাবে প্রশিক্ষিত কুকুর জীবিত মানুষকে খুঁজে বের করে এতে সময় ও প্রাণ উভয়েই বেঁচে যাচ্ছে।

তবে, এই বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্যকারীরা চাকরির নিরাপত্তা আর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মত কিছু প্রশ্নও তোলে। তারা কি মানুষকে প্রতিস্থাপন করবে? তারা যখন আমাদের অভ্যাস শিখছে, তখন আমাদের ডেটা সংগ্রহের বিষয়ে কি কোনও উদ্বেগ থাকবে? এই প্রশ্নগুলোই মনে করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি নতুন চমৎকার আবিষ্কারের পেছনেই কিছু অজানা দিক থাকে।

তার পরও, বর্তমানের এআই-চালিত রোবটিকস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসামান্য সুবিধা আনছে: একঘেয়ে কাজ কমাচ্ছে, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাইক্রোওয়েভ বা স্মার্টফোনের মতো এগুলোও আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। ফলে আমাদের এর সম্ভাবনাকেও যেমন স্বাগত জানাতে হবে,

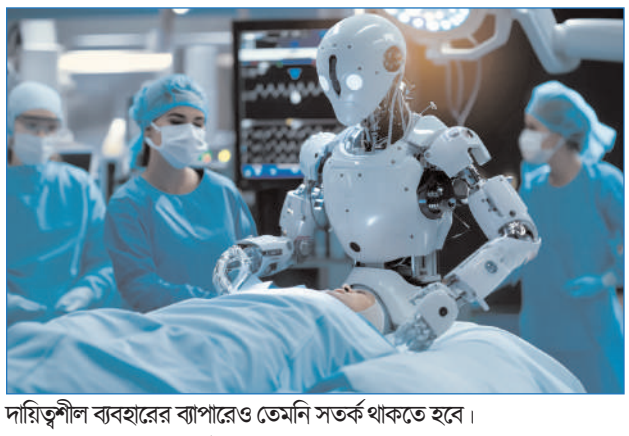

দায়িত্বশীল ব্যবহারের ব্যাপারেও তেমনি সতর্ক থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবায় এআই ও রোবট

ভাবুন, একজন সার্জনের হাতে এমন এক যাদুকরী স্ক্যালপেল আছে যা কখনোই কাঁপে না। এটাই প্রায় বাস্তব করে তুলছে এআই-চালিত রোবটিক সার্জারির নিখুঁতভাবে কাটা এবং দ্রুত রোগমুক্তির সম্ভাবনা। বিশ্বের বিভিন্ন হাসপাতালে, রোবট ও এআই ডাক্তার-নার্সদের সাথে মিলে রোগীদের আরও উন্নত সেবা দিচ্ছে। এরা যেন নিরলস সহকারী, সূক্ষ্ম কাজগুলো যারা একেবারে নিখুঁতভাবে করে যায়।

এআই দ্বারা পরিচালিত ডায়াগনস্টিক টুল এক্স-রে ও এমআরআই-এর মতো ছবি স্ক্যান করে, যেন কোনও গোয়েন্দা অপরাধের সূত্র খুঁজে বের করছে। এর ফলে ডাক্তাররা দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। শারীরিক থেরাপিতে রোবটিকস বহু রোগীদের ব্যায়াম করিয়ে দেয়, যেন ধৈর্যশীল একজন জিম প্রশিক্ষক শান্তভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

এগুলো মানবিক ভুলের আশঙ্কাও কমিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ফার্মাসি রোবট সঠিক মাত্রায় ওষুধ বিতরণ করতে পারে, নিশ্চিত করে যে রোগী সঠিক ডোজ পাচ্ছেন। এটি বিশেষভাবে জনাকীর্ণ হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

তবে, কেউ কেউ ভাবছেন "মানবিক ছোঁয়া" হারিয়ে যাবে কি না? রোবট একঘেয়ে কাজ বা ভারী বোঝা বহনে দক্ষ হলেও, তারা মানুষের হাসিমুখ বা সান্ত্বনা জোগানোর স্পর্শ দিতে পারে না। সেই উষ্ণতা এখনও ডাক্তার-নার্সদের হাতেই আছে।

সর্বোপরি, এআই আর রোবটিকস স্বাস্থ্যসেবাকে দখল করার জন্য নয়, বরং শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এগুলো মানুষের হাতে আরও সময় ও সুযোগ দিচ্ছে সহানুভূতি, উন্নত সমস্যার সমাধান আর রোগীর সাথে আস্থা গড়ে তুলতে। যখন এই "ধাতব হাত" আরও সাধারণ হয়ে উঠবে, তখন স্বাস্থ্যসেবার জগত হবে আরও নিখুঁত, অপেক্ষার লাইন হবে ছোট, আর জীবনের মান হবে আরও উন্নত।

কাজের জগতে এক নতুন রূপ

একটি বিশাল জিগস পাজলের কথা ভাবুন, যেখানে প্রতিটি খন্ডকে নিখুঁতভাবে বসাতে হবে। সারা বিশ্বের শিল্পে এআই-চালিত রোবট যেন দক্ষ পাজল বিশেষজ্ঞ, প্রতিটি অংশকে সঠিক জায়গায় বসায় নিখুঁতভাবে। কারখানাগুলো এখন উচ্চমাত্রার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ভরা, যেগুলো প্রয়োজনে উৎপাদন লাইন দ্রুত বদলে ফেলতে পারে

যেন রং বদলানো গিরগিটি যে কোন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়।

এই রোবটগুলো গতি, নিখুঁততা বা পুনরাবৃত্তিমূলক গতিবিধি প্রয়োজন এমন কাজে অসাধারণ যেমন ইলেকট্রনিক্স একত্র করা বা পণ্য প্যাকেজ করা। তাৎক্ষণিক ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা বড় ধরনের সমস্যা হওয়ার আগেই সতর্ক সংকেত দেয়, যেন দুর্গের প্রহরীর মতো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এটি কোম্পানিগুলোর কোটি কোটি টাকা বাঁচায় এবং ভরসাও বাড়ায়।

কিন্তু এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। সেই কর্মীদের কি হবে, যাদের জায়গায় অক্লান্ত রোবট কাজ নেবে, যারা কখনও ক্লান্ত হয় না বা ছুটি চায় না? অনেক বিশেষজ্ঞের মত, রোবট যে সব একঘেয়ে বা বিপজ্জনক কাজ করে, সে সব থেকে মানুষের সময় বাঁচবে এবং মানুষ সৃজনশীলতা, সহানুভূতি বা কৌশলগত চিন্তাভাবনার মতো কাজে আরও মনোযোগ দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত, একটি রোবট স্মার্টফোন তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেটার জন্য আবেদনময়ী অ্যাপ ডিজাইন করতে পারে না।

অটোমোবাইল কারখানা থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সব জায়গাতেই এআই-চালিত রোবট বড় পরিসরে উপকার করছে: দক্ষতা বাড়ছে, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হচ্ছে, অপচয় কমছে। তবে এই প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি: কর্মীদের নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হবে, আর ব্যবস্থাপকদের মানুষ আর মেশিনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

সুতরাং, আগামীকালের কর্মক্ষেত্র হয়তো অন্যরকম হবে, কিন্তু সেখানে মানুষ ও রোবটের পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে যান্ত্রিক কাজ রোবট সামলাবে আর মানুষ দেবে উদ্ভাবনী চিন্তা, উষ্ণতা, আর কল্পনার ঝলক।

এআই, অটোমেশন আর ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান

একটি জনাকীর্ণ বাজারের কথা ভাবুন, যেখানে পুরনো কিছু দোকান বন্ধ হচ্ছে, আবার রাতারাতি নতুন কিছু দোকান গড়ে উঠছে। এটাই এআই-চালিত রোবটিকসের যুগে চাকরির চিত্র। কিছু কিছু পেশা যেমন অ্যাসেম্বলি লাইনে কাজ করা শ্রমিক আটকে যেতে পারে, কারণ রোবট সেই কাজগুলো সহজে করে ফেলবে। আবার ড্রোন অপারেটর বা এআই নীতিমালা বিশ্লেষকের মতো পেশা হঠাৎ করেই আবির্ভূত হতে পারে, যেন আকাশে নতুন তারার উদয়।

অনেকেই ভয় পান, রোবট সব চাকরি কেড়ে নেবে, মানুষ হয়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়। আসলে, ইতিহাস বলে যে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নতুন ধরনের সুযোগও নিয়ে আসে। যেমন কম্পিউটার টাইপিস্টদের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে, কিন্তু এক ঝাঁক আইটি পেশাজীবী আর ওয়েব ডিজাইনার তৈরি করেছে। এআই-চালিত রোবট শ্রমসাধ্য, একঘেয়ে কাজ সামলে নেয়, ফলে মানুষ সৃজনশীলতা, সহানুভূতি, আর সমালোচনামূলক চিন্তার কাজে বেশি সময় দিতে পারে যেখানে এখনো মেশিন দুর্বল।

তবে, এই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে প্রয়োজন দূরদর্শী কৌশল। শিক্ষাব্যবস্থা আর কোম্পানিগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কর্মীরা সমস্যা সমাধান, সম্পর্ক গড়ে তোলা, বা শিল্পময় দক্ষতার কাজে দক্ষ হয়। সরকারও হয়তো পুনরায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে পারে, যাদের চাকরি অটোমেশনের ফলে হুমকিতে পড়ছে।।

এটাও মনে রাখা দরকার যে, রোবট অসাধারণ কিছু করুক না কেন, তারা কখনোই স্বপ্ন দেখে না বা কোন সমস্যায় বিরক্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে না। আবেগ, সৃজনশীলতা আর গতিশীল চিন্তাভাবনায় এখনও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট। তাই রোবটের দক্ষতা আর মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে একত্রিত করে আমরা এমন এক শক্তিশালী জোট গড়তে পারি, যেখানে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়। ভয় না করে বরং এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করে আমাদের উচিত ভবিষ্যতের চাকরির ক্ষেত্র গড়ে তোলা, যাতে এআই-এর শক্তি ও মানুষের মেধা একসাথে কাজ করে।

বিনোদন, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এআই রোবট

একটি আধুনিক খেলার মাঠ কল্পনা করুন, যেখানে যান্ত্রিক সঙ্গীরা বাচ্চাদের সাথে শেখে, মজার গেমের মাধ্যমে গণিত শেখায়, আর প্রতিটি শিশুর দক্ষতার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে যায়। ক্লাসরুমে এআই-চালিত রোবট চক বোর্ডের মতো সাধারণ হয়ে উঠতে পারে, কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে শেখানোর জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেবে।

বিনোদন জগতে কল্পনা করুন, থিম পার্কে রোবটগুলো ব্রডওয়ে তারকার মতো নাচছে বা নানা ভূমিকা নিয়ে দর্শকদের তুমুল আনন্দ দিচ্ছে। এদের কখনও ক্লান্তি আসে না কিংবা এরা সংলাপও ভুলে যায় না, ফলে একই মাত্রার উত্তেজনা ধরে রাখতে পারে। বাড়িতে রোবট পোষা প্রাণী থাকতে পারে, যারা কোনো অ্যালার্জির কারণ হবে না বা প্রতিদিন হাঁটতে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই টামাগোচি খেলার মতোই, তবে বাস্তবে।

এমনকি খেলাধুলায়ও এআই রোবট তাদের সক্ষমতা দেখাচ্ছে। রোবটিক ফুটবল টিম প্রতিযোগিতায় নামে, বিদ্যুৎগতিতে গণনা করে প্রতিপক্ষকে হারানোর চেষ্টা করে। যদিও মানুষ খেলোয়াড়দের স্থান দখল করবে না, তবে এটা দেখায় যে কৌশল আর রোবটের ক্ষিপ্রতা একত্রে কী করতে পারে।

কিন্তু, এই বুদ্ধিমান সঙ্গীদের ব্যাপক বিস্তারে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। বাচ্চারা কি ধাতব বন্ধুকে বেশি ভালোবাসবে, মানুষ বন্ধুদের তুলনায়? কিংবা উন্নত বিনোদন রোবট কি ঐতিহ্যবাহী শিল্প কিংবা পারফরম্যান্সকে ঢেকে দেবে?

এই সম্ভাবনা গুলোকে দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজে লাগানো জরুরি। এআই রোবট যথাযথ নিয়ন্ত্রণে সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে, বিনোদন, শিক্ষা আর সৃজনশীল ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসতে পারে। এটি যেন ক্লাসে আসা এক অসাধারণ মেধাবী নতুন বন্ধু: সবার জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে, তবে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে। যদি আমরা সঠিকভাবে এগোই, এআই রোবট শুধু শিল্পে নয়, আমাদের শখ আর আগ্রহের জাগতিক নানা ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করতে পারবে।

আগামীর পথচলা

একটি ভবিষ্যত নগরীর কথা কল্পনা করুন, যেখানে ড্রোন বাসা পর্যন্ত নতুন বাজার সদাই পৌঁছে দিচ্ছে, চালকবিহীন গাড়ি রাস্তায় ছন্দময় গতিতে চলছে, কোনো যানজট নেই, আর ব্যক্তিগত রোবট সঙ্গী রোজকার ছোটখাটো কাজ সামলে দিচ্ছে। এটা কোনো সায়েন্স ফিকশন দৃশ্য নয়, খুব বেশি দূরের ভবিষ্যতের কথাও নয়। এআই-চালিত রোবট আমাদের রুটিনকে বদলে দিতে পারে, যেমন স্মার্টফোন আমাদের যোগাযোগকে বদলে দিয়েছিল।

একটি সম্ভাব্য উদ্ভাবন হতে পারে "ঝাঁক রোবট" (swarm robots), ছোট ছোট যন্ত্র যা পিঁপড়ের ঝাঁকের মতো এক সঙ্গে কাজ করে। তারা হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর অবকাঠামো পুনর্গঠন করবে বা দ্রুত বন তৈরি করতে লাখো গাছ রোপণ করবে যা মানুষের পক্ষে করা কঠিন। অন্যদিকে মহাকাশ অনুসন্ধানেও তারা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে, দূর গ্রহ-উপগ্রহে নমুনা সংগ্রহ করবে আমাদের পদচিহ্ন পড়ার আগেই।

তবে, এই সব উন্নতিতে প্রয়োজন শক্তপোক্ত নির্দেশিকা। রোবট মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আসেভুল হলে দায়ী কে হবে? এআই যন্ত্রগুলোর কি কোনো অধিকার থাকবে? এমন সব বিতর্ক আইনি এবং নৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, যাতে আমরা উদ্ভাবনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখতে পারি।

এই বহুল অটোমেশনের দুনিয়ায় আমাদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে, কীভাবে সহানুভূতি, সৃজনশীলতা ও আন্তরিকতা অক্ষুণ্ন রাখা যায়। কারণ রোবট যদি নিখুঁতভাবে একটি সিম্ফনি পরিচালনাও করে, মানুষের আবেগ বা প্রতিটি সুরে মিশে থাকা অনুভূতি কিন্তু বুঝতে পারবে না। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল, কীভাবে সহাবস্থান করব যাতে প্রযুক্তি আমাদের সামর্থ্য বাড়ায়, আবার আমাদের মানবিক মূল্যবোধও অটুট থাকে।

সামনের পথ সম্ভাবনা ও জটিলতায় পরিপূর্ণ। আমরা যখন এই উদ্ভাবনকে গ্রহণ করছি, মনে রাখতে হবে এআই-চালিত রোবটিকসকে দায়িত্বের সাথে পরিচালিত করতে হবে, যেন যান্ত্রিক শক্তি আর মানুষের স্পন্দন একসাথে এগিয়ে যেতে পারে।

কমপিউটার প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ
ritaban.mukherjee@icloud.com

ছায়াপথে সংঘাত

নবদীপা দাস

প্রায় ১৩.৪ বিলিয়ন বছর আগে যে মহাজাগতিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাকাশ বা মহাবিশ্বের বিস্তার শুরু হয়েছিলো তা বিগ ব্যাং বলেই পরিচিত। সেই মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পর থেকেই বিভিন্ন ছায়াপথ সৃষ্টি হয় এবং তা ছড়িয়ে পরে মহাকাশে। বিভিন্ন ছায়াপথ গুলো একে অপরের থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে এই মহাকাশের প্রসারের জন্যই।

আমাদের সৌর জগত এই রকমই এক ছায়া পথের অংশ, যার নাম আকাশগঙ্গা। আকাশ গঙ্গায় নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় এক'শ থেকে চারশো কোটি।

আমাদের আকাশগঙ্গা বা milky-way ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের আরেকটি ছায়াপথ হলো এনড্রোমিডা (Andromeda) বা M31. Andromedaq নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ কোটি অর্থাৎ Andromeda আমাদের আকাশ গঙ্গা র থেকে কয়েক লক্ষ গুণ বড়। Andromeda আমাদের আকাশগঙ্গা থেকে এখনও প্রায় ২. ৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে ২০১২ সালে প্রথম নাসা তার হাবল স্পেস টেলিস্কোপের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এই গ৩১ ছায়াপথ ১১ কিমি/সে. বেগে আমাদের Milky-wayi দিকে ধেয়ে আসছে। এই বেগেই ধেয়ে এলে প্রায় চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন বছর পর দুটি ছায়াপথের সংঘর্ষ

ঘটবে ।

তবে এই সংঘর্ষ মোটেও গাড়ি দুর্ঘটনার মত সরাসরি সংঘর্ষ নয়। এই সংঘর্ষে আসলে দুটি ছায়াপথ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ফলে, তৈরি হবে এক নতুন, আরও বড় এক ছায়াপথ। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Milkdromida.

কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে বিগ ব্যাং- এর পর থেকে মহাকাশের প্রসারের জন্য ছায়াপথগুলো একে অপরের থেকে ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেখানে এই দুই ছায়াপথের সংঘর্ষ কেন ঘটবে ?

এর একমাত্র কারণ হিসেবে বিজ্ঞানী রা বলেছেন এই M31 এবং Milky-way ছায়া পথ এর দূরত্ব সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের তুলনায় অনেক কম আর তাই এদের মধ্যে কাজ করছে মহাকর্ষ বল।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন এটা Andromeda-র প্রথম সংঘর্ষ নয়, অতীতেও Andromeda এরকম বহু সংঘর্ষ ঘটিয়েই নিজের আকার ও আয়তনের প্রসার ঘটিয়েছে। Andromedai ব্যাস প্রায় ১২০০০০ আলোকবর্ষ এবং আকাশগঙ্গার বয়স ১২০০০ আলোকবর্ষ।

সম্প্রতি ২০২৫ সালে আরও নতুন তথ্য গণনার পর নাসা জানায় এই সংঘর্ষে কোনো ক্ষতি হবে না সৌর জগতের, পৃথিবীও থাকবে অক্ষত। শুধুমাত্র আকার ও আয়তনে বিশাল এক ছায়াপথের সৃষ্টি হবে মহাকাশে।

এই দুটি ছায়াপথের মিলনের ফলে ছায়াপথ দুটির কৃষ্ণ গহবর দুটি মিলেমিশে তৈরি করবে নতুন এক বৃহদাকার এক কৃষ্ণ গহ্বর। Andromeda ছায়াপথ এখনো ২.৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

তবুও যেদিন এই সংঘর্ষ ঘটবে সেই রাতের আকাশের পূর্বাভাসও দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের ধারণা সেদিন আলোর ফুলঝুরিতে ভর্তি হয়ে যাবে আকাশ। আতস বাজির ঝলকানির মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেদিনের আকাশ ।

তথ্য সুত্র :

১) Nasa Hubble Studz (২০১২)
২) Nature Astronomy (২০২৫)

প্রসঙ্গত: ১ আলোকবর্ষ = 9.46x10^15 মিটার
১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ বা ১০০০০০০
১বিলিয়ন = ১০০ কোটি বা ১০০০০০০০০০

ছাত্রী, ৩৮তম বিজ্ঞান সাংবাদিকতা (অ্যাডভান্সড) কোর্স, ইসনা

পাঁচটি দশক পরে চাঁদে আবার এল ফিরে

শিবশঙ্কর পালিত

আর্টেমিস ২ এর মহাকাশযাত্রীরা (বাঁ থেকে ডানে): নাসার রেইড ওয়াইসম্যান (কমান্ডার), ভিক্টর গ্লোভার (পাইলট), ক্রিস্টিনা কোচ (মিশন বিজ্ঞান ও সিস্টেম সাপোর্ট/মিশন স্পেশালিস্ট), এবং কানাডা স্পেস এজেন্সির জেরেমি হ্যানসেন (মিশন স্পেশালিস্ট)। (ক্রেডিট: NASA)

১ এপ্রিল, ২০২৬-এ আমেরিকার নাসা আর একটা বড় ইতিহাস গড়ল মহাকাশে। প্রায় ৫৩ বছর পর আবার মানুষকে গভীর মহাকাশে পাঠিয়েছিল, চাঁদের গা ঘেঁষে একটা দুর্দান্ত ভ্রমণের জন্য এই যাত্রার নাম আর্টেমিস-২ (ArtemisII)।

কিন্তু এই মিশন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আর্টেমিস-২ ছিল আর্টেমিস প্রোগ্রাম-এর প্রথম মানবযুক্ত মহাকাশ উড়ান, যার মাধ্যমে নাসা চেয়েছিল আবার মানুষকে বাস্তব অর্থে চাঁদে ফিরিয়ে আনতে।

১৯৭২-এর অ্যাপোলো-১৭ অভিযানের পর থেকে কোন মানুষই চাঁদে পাড়ি দেয়নি; এই ফাঁক আবার ভরাট করার প্রথম ধাপই হয়েছিল আর্টেমিস-২। মিশনটা আসলে একটা পরীক্ষামূলক উড়ান ছিল। এখানে চাঁদে নামা হয়নি, কিন্তু চাঁদের চারপাশ দিয়ে একটা "ফ্লাইবাই" করে ওরিয়ন (Orion) স্পেসক্রাফ্টে ফিরেছিলেন চারজন মহাকাশচারী।

এই দুর্দান্ত ১০-দিনের ভ্রমণের মাধ্যমে ওরিয়ন স্পেসক্রাফ্ট এবং Space Launch Szstem (SLS) রকেটের সব সিস্টেম টেস্ট করা হয়েছিল, যাতে পরের আর্টেমিস-৩ মিশনে চাঁদে নামার সময় সব কিছু নিশ্চিত হয়।

আর্টেমিস-২-এর মহাকাশচারীরা ছিলেন চারজন বিশেষ মানুষের সমন্বয়: নাসার রেইড ওয়াইসম্যান (কমান্ডার), ভিক্টর গ্লোভার (পাইলট), ক্রিস্টিনা কোচ (মিশন বিজ্ঞান ও সিস্টেম সাপোর্ট), আর কানাডা স্পেস এজেন্সির জেরেমি হ্যানসেন (মিশন স্পেশালিস্ট)।

এই দলটি চাঁদের "ফ্রি-রিটার্ন" কক্ষপথে ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল, অর্থাৎ রকেট শক্তি কমে গেলেও মাধ্যাকর্ষণ নিজেই তাঁদের ফিরিয়ে আনে, যেটা ছিল প্রাকৃতিক বাঁক দিয়ে একটি সুরক্ষিত ঘূর্ণন।

জানা গিয়েছিল, তাঁদের ওরিয়ন স্পেসক্রাফ্টটির নাম দেওয়া হয়েছিল "ইন্টেগ্রিটি" (Integrit), যা তাঁদের দলগত একতা ও দায়িত্বের স্মারক হিসেবে থেকে গেল। এই যাত্রায় তাঁরা শুধু ভ্রমণ করেননি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সিস্টেম চেক, মানুষের দীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমণের স্বাস্থ্যঘটিত ডেটা সংগ্রহসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।

এই মহাকাশচারীদের একজন হিসেবে ক্রিস্টিনা কোচ হয়ে উঠেছিলেন মানব ইতিহাসে প্রথম মহিলা মহাকাশচারী, যিনি সরাসরি চাঁদের গভীর মহাকাশ মিশনে গিয়েছিলেন, আর ভিক্টর গ্লোভার হয়ে উঠেছিলেন প্রথম মার্কিন ব্ল্যাক কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে চাঁদের মিশনে যাওয়া মহাকাশচারী।

আর্টেমিস-২ শুধু চাঁদে যাওয়ার কাহিনী ছিল না, এটা ছিল মঙ্গল ও আরও দূরের গন্তব্যের জন্য ভিত গড়ার প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ। নাসার কথায়, এই সফল মিশন শুধু চাঁদে ফেরার বন্দোবস্তই করেনি, ভবিষ্যতে মানুষের মঙ্গল গ্রহে হাঁটার জন্যও "প্রুফ অফ কনসেপ্ট" দিয়েছিল।

আর্টেমিস-২ শুরু হয়েছিল একটা বার্তা নিয়ে: আমরা শুধু পৃথিবীতে থাকব না, মহাকাশের দিকেও হাত বাড়াব; আবার আসিব ফিরে, চাঁদের দিকে ডানা মেলে।

আর সেই ডানা মেলানোর প্রথম প্রকৃত পদক্ষেপ ঘটেছিল চার নির্ভীক আর্টেমিস জেনারেশন-এর মহাকাশচারীদের হাত ধরে।

বিজ্ঞান লেখক, LIFE To & Beyond Foundation, India

বিড়লা সংগ্রহশালায় পূর্ব ভারত বিজ্ঞান মেলা: একটি প্রতিবেদন

সৈকত কুমার বসু

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (বিআইটিএম), যা ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস (এনসিএসএম)-এর একটি অঙ্গসংস্থা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলে, সমাজে একটি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য আবিষ্কার-ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিপূরক করে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, বিআইটিএম ১৯৭৫ সালে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ফেয়ার (ইআইএসএফ) শুরু করেছিল। তখন থেকেই এটি এই জাদুঘর দ্বারা আয়োজিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। ইআইএসএফ-এর প্রতি পূর্ব ভারতের স্কুল এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল সাড়া আমাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে এবং ২০০২ সালে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার (এসইএফ) শুরু করতে উৎসাহিত করেছে।

এই দুটি মেলাই এখন পূর্ব ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্ভাবনী মডেল ও প্রকল্পের আকারে তাদের বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা তুলে ধরার এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা বিপুল সংখ্যক দর্শকের সামনে তা উপস্থাপন করার একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ফেয়ার (ইআইএসএফ) এবং সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার (এসইএফ) হল পূর্ব ভারতের স্কুল শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্মিত উদ্ভাবনী বিজ্ঞান মডেল/প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আয়োজন। এটি তরুণদের সৃজনশীল সম্ভাবনা প্রদর্শনের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম। চার দিনব্যাপী মেগা ইভেন্ট যেখানে ৫,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী এবং সাধারণ দর্শক অংশগ্রহণ করেন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি এবং সাধারণ মানুষকে একটি ফলপ্রসূ বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য এই মিলনক্ষেত্রে একত্রিত করে।

বিজ্ঞান মেলাটি একটি বহু-স্তরীয় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, যা প্রথমে জেলা পর্যায়ে, তারপর রাজ্য পর্যায়ে এবং অবশেষে পূর্ব ভারতে আন্তঃরাজ্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল থেকে মডেল এবং প্রদর্শনী নিয়ে এককভাবে বা দুইজনের দলে অংশগ্রহণ করার যোগ্য।

ইআইএসএফ পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যের এসসিইআরটি এবং শিক্ষা বিভাগ; এনসিইআরটি, নয়াদিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব পরিষেবা বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ারে পলিটেকনিক ও ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, যারা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্বাচিত হয়, তারা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

বিগত ৪৯তম পূর্ব ভারত বিজ্ঞান মেলা (EISF) এবং ২৩তম বিজ্ঞান ও প্রকৌশল মেলাটি (SEF) ১৩-১৬ জানুয়ারি কলকাতার বিআইটিএম-এ নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে আয়োজিত হল।

মূল প্রতিপাদ্য: বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের জন্য স্টেম

উপ-প্রতিপাদ্যসমূহ:

১. টেঁকসই কৃষি
২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্লাস্টিকের বিকল্প
৩. সবুজ শক্তি
৪. উদীয়মান প্রযুক্তি
৫. বিনোদনমূলক গাণিতিক মডেলিং
৬. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি
৭. জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

EISF ২০২৬-এর অনুষ্ঠানমালা গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩:০০টেয় উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক বিক্রমজিৎ বসু, অধিকর্তা, সিএসআইআর-সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট; এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সংগ্রাম বাগ, বায়োফিজিক্স অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল জিনোমিক্স বিভাগ, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

এই মেলায় পূর্ব ভারতের স্কুল, পলিটেকনিক

ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা দেখা গেল। জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতার পর শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ১০০টিরও বেশি বিজয়ী মডেল ও প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী এতে অংশ নেন। প্রদর্শনীতে সাধারণ বিজ্ঞান মডেল থেকে শুরু করে জটিল প্রকৌশল প্রোটোটাইপ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ছিল।

এই ব্যাপক অংশগ্রহণ তরুণ উদ্ভাবকদের মধ্যে ধারণা অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বৈচিত্র্যের উপর অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল। মেলাটি নির্দিষ্ট পরিদর্শনের সময়সূচী সহ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যা অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানপ্রেমী এবং সাধারণ দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। এটি সমাজের জন্য তরুণ শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সাথে যুক্ত হওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে স্টেম ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক আগ্রহ উৎসারিত করেছিল।

প্রকল্পের মূল প্রদর্শনীর বাইরে, উওঝাঝুঝউঝ ২০২৬ বেশ কিছু ইন্টারেক্টিম এবং শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সুযোগ, যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তি মূল্যায়নের জন্য আন্তঃরাজ্য কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ পর্ব যা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী যা অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা সৃজনশীলতা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন হয়ে উঠেছিল।

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ও প্রকৌশল মেলা ২০২৬ সফলভাবে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগানো, সমবয়সীদের মধ্যে শিক্ষা উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতের উদ্ভাবকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য অর্জন করেছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষকে অর্থবহ সামাজিক প্রতিপাদ্যের সাথে একত্রিত করে, এই মেলাটি তুলে ধরেছে যে কীভাবে তরুণ মন একটি উন্নত, স্থিতিস্থাপক এবং আত্মনির্ভর ভারতে অবদান রাখতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই অনুষ্ঠানটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করা এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিআইটিএম-এর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকাটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, যেখানে শিক্ষার্থীরা অন্বেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উদ্ভাবন করতে পারে।

ছবি: প্রতিবেদক স্বয়ং
প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা: ইসনা এগিয়ে চলুক

মালবিকা সেনগুপ্ত

গত ২২শে মার্চ, ২০২৬, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গণে এন. আর. সেন অডিটোরিয়ামে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংস্থার সচিব, ড. অমিতকৃষ্ণ দে গত এক বছরে সংস্থার সাংগঠনিক যা পরিবর্তন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। আগে দুজন সেক্রেটারি থাকতেন, কিন্তু সরকারি নিয়মানুসারে এখন একজন সেক্রেটারির পদ অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টদের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, বর্ষীয়ান অধ্যাপক শ্রী মানস চক্রবর্তীও ২০২৬-২৭ সাল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হলেন।

ইসনার কাউন্সিল মেম্বারদের তালিকায় নতুন চার জনের নাম যুক্ত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

কোষাধক্ষ্য ড. প্রবীর সাহা বিগত আর্থিক বছরের মূল্যায়ন করে হিসাবপত্র বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করেন।

এর পরে সংস্থার সভাপতি ড. বিকাশ চক্রবর্তী ইসনার অতীত গৌরবময় দিনগুলির কথা আলোচনা করেন, এবং কিভাবে বর্তমান আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে

বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. সুরভী বন্দোপাধ্যায় অতীত ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ড. অসীমা চ্যাটার্জীর সঙ্গে কিভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। ইসনার মত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে আরও অধিক ছাত্রছাত্রীদের যোগদান করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ইসনার বিশিষ্ট পত্রিকা "সায়েন্স এন্ড কালচার" এর বিশেষ সংখ্যা, এবং ই-পেপার "সাইন্টিফিকা কমিউনিকা"র উন্মোচন ঘটে।

কোষাধক্ষ্য ড. প্রবীর সাহা এরপর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের স্মারক স্বরূপ ড. সুরভী বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়।

সদস্যা, কার্যকরী সমিতি, ইসনা

গরমের উত্তাপ, ভোটের উত্তাপের আড়ালে আরও এক উত্তাপের নীরব আয়োজন

অশোক সেনগুপ্ত

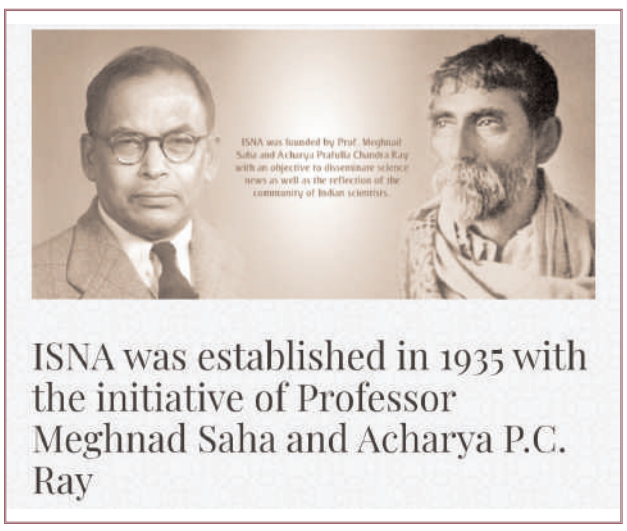

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ও বিকাশে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বাংলা। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী (প্রথম ভারতীয় যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান), জগদীশ চন্দ্র বসু, এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো মনীষীরা এই চর্চাকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় শিল্পায়নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটান। ১৯১৭ সালে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চায় মাইলফলক হিসেবে পরিচিত।

তারও আগে, ১৮৫৪ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্যোগে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে কারিগরি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টা শুরু হয়। পরবর্তীতে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

তৈরি হয়েছিল ক্যালকাটা কেমিক্যালস, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা, বিড়লা তারামণ্ডল, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম (এনসিএসএম)-নিয়ন্ত্রিত সায়েন্স সিটি-সহ কিছু স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান।

১৮৭৬ সালের জানুয়ারিতে ড. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এটি ছিল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নোবেলজয়ী সি ভি রমন থেকে শুরু করে বিশ্ববিশ্রুত বহু বিজ্ঞানীর মেধা ও মননে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার গবেষণা। বেড়েছে বিজ্ঞানচর্চার ব্যপ্তি।

এতে নীরবে সঙ্গ দিয়েছে ১৯৩৫ সালে তৈরি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা)। আঁতুরঘরে ইসনা-কে লালনের মূল দায়িত্বে ছিলেন দুই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা। ওঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন আরও প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক এবং সমাজসেবীরা। অচিরেই প্রকাশিত হয়েছিল ইসনার জগতজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা, সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, যা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্বজন সমাজে সমাদৃত। আরও অনেকের সাথে সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. সুধেন্দু মন্ডল।

এরই মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে গত ৩৮ বছর ধরে ইসনা চালিয়ে এসেছে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের কর্মসূচি। সময় বদলেছে, এসে গিয়েছে সমাজ মাধ্যম। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচীও ঢেলে সাজানো হয়েছে।

বিগত করোনা মহামারীর সময় ইসনার মুকুটে জুড়েছে নতুন পালক। ২০২১-এর ১৫ আগস্ট কলকাতা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে দুটি জনপ্রিয় দ্বিভাষিক বিজ্ঞান পত্রিকা বা ই-পেপার। নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করে চলেছেন 'ইসনা'-র সহ সভাপতি অগ্রজ, কৃতী সাংবাদিক প্রশান্ত কুমার বসু।

পায়ে পায়ে সেই 'ইসনা' পেরিয়ে এলো ৯০ বছর। আর দেড়শ বছর হলো কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর। এই বাতাবরণে 'ধরিত্রী দিবস' উদযাপন এবং এ শহরের আর এক গর্বের উদ্যোগ 'পুরনো কলকাতার গল্প'-র কীর্তিকে স্মরণ করতে ২২ এপ্রিল একটি মহতী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এটি হবে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে (রাসবিহারী প্রাঙ্গণ) আর এন সেন অডিটোরিয়ামে। তাতে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ আশুতোষ ঘোষ।

উত্তপ্ত আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার ঠিক আগের দিন, বুধবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞান কলেজের ওই মহতী সমাবেশের উত্তাপের মাত্রা কতটা, তার বিচারক আপনারাই। উপস্থিত থাকবেন বেশ কিছু জ্ঞানীগুণী এবং গবেষকবৃন্দ।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদক, Newscope Bangla.

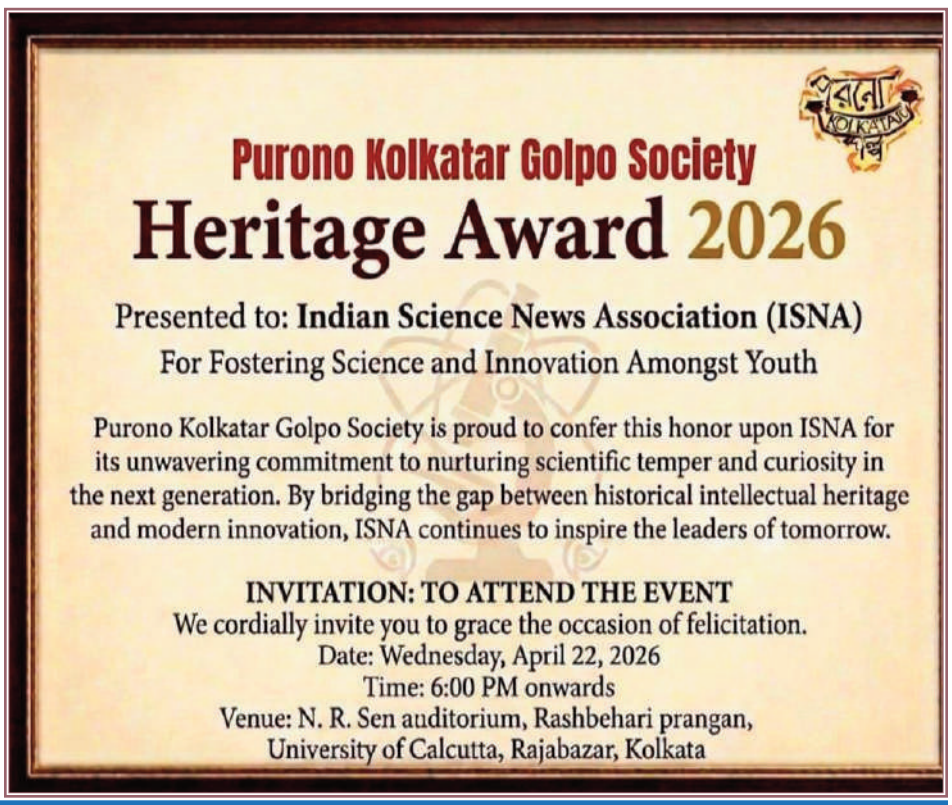

অতি সঙ্কটে সুন্দরবন, সঙ্কটে কলকাতাও

পাতা ১ এর পর>>

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এক সকালে বাড়িতে ফোন। একটা দারুন ব্যাপার শুরু করেছি আমরা। তোমাকে আমি দেখাতে চাই। চলে এস।'

সুন্দরবনে জঙ্গলের ঘনত্ব কমায় বনকর্তারা দুশ্চিন্তায় ছিলেন অনেকদিন ধরেই। এতে সেখানকার বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হতে পারে এবং পরিশেষে তা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্বে থাবা বসাতে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক কোন অঞ্চলে কি হারে জঙ্গলের ঘনত্ব কমছে তা সঠিক ধরা পড়ছিল না। সুন্দরবনের ওপরেই খুব নিচু দিয়ে বিমান উড়িয়ে ছবি তুলেও প্রকৃত চিত্রটা ধরা পড়ছিল না। একমাত্র উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল। তাই বন দফতরেই আলাদা করে খোলা হয়েছিল রিমোট সেন্সিং দফতর।

ঠিক হয়েছিল, বন দফতরের আধিকারিকদের বাইরে এই প্রথম অন্য কাউকে দেখানো হবে ওই প্রযুক্তির ফলাফল। অতনু রাহার অফিসে গিয়ে দেখলাম আমন্ত্রিত বাইরের লোক একজনই। সেটা আমি।

অতনুবাবু ২০ বছরের আগেকার মানচিত্রের সঙ্গে সেইদিন সকালের মানচিত্রের তুলনা করে বললেন, 'যেখানে যেখানে লাল রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সেখানে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের ঘনত্ব কমেছে। সেখানে ম্যানগ্রোভ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। মনে হয় গাছগুলোর উচ্চতা কমেছে, কমেছে তাদের ডালপালাও।' বন দফতরের আধিকারিকদের প্রাথমিক গবেষণাই যে ঠিক, তা পরবর্তী সময়ে পরিষ্কার হয়েছে।

সুন্দরবনের মাঝখানের উঁচু জায়গায় মিষ্টি জলের প্রবাহ একেবারে কমে যাওয়ায় সেখানে নুনের ভাগ বেড়েছে। সেই পরিবেশে টিকে থাকতে অভিযোজন হয়েছে ম্যানগ্রোভের। তাদের উচ্চতা কমে গেছে অনেকটাই।

অতনুবাবুই সুন্দরবনের প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রায়ই সঙ্গে করে সেখানে সেখানে নিয়ে গেছেন। কোন গাছের কি চরিত্র, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে কোন প্রাণীর কি গুরুত্ব তা একজন শিক্ষকের মতো শিখিয়েছেন। তাই সম্পর্কটা তুমিতে নেমে এসেছে খুব কম দিনেই।

যদিও অতনুবাবুর সঙ্গে পরিচয়েরও আগে একজন আমাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গল চিনিয়েছেন হাতে ধরে। সাধারণ পর্যটক যেতে পারেন না যে জায়গায়, সেই অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলের জঙ্গলও আমার দেখা হয়েছে তাঁরই দৌলতে। নিয়ে গেছেন অরুণাচল প্রদেশের গহীন অরণ্যে। গা ছম ছম করে সেখানে। ওঁর সঙ্গেই গেছি অসম-অরুণাচল-ভুটান সীমান্তের পাহাড়ি জঙ্গলে। তিনি অসমের বনকর্তা সঞ্জয় দেবরায়।

গুয়াহাটির রেহাবাড়িতে তাঁর সরকারি আবাসে স্টাফড্ বা ট্যাক্সিডার্মি করা গণ্ডারের পা দিয়ে তৈরি টুলের ওপরে বসে মানস অভয়ারণ্যে বাঘের সংরক্ষণের গল্প শুনতে শুনতে শুনতে কখন যে রাত গভীর হয়েছে খেয়ালই করিনি। বর্ষার কাজিরাঙায় সঙ্গী হয়েছি তাঁর। দেখেছি সন্তানস্নেহে বানভাসি গণ্ডারের ছানাকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াতে।

ছোটবেলা থেকেই প্রথমে মা, এবং পরে নরেন্দ্রপুরের শিক্ষক হারাধনদার কাছে গাছপালাকে ভালোবাসার শিক্ষা শুরু। সেটাই পরবর্তীতে নেশা হয়ে দাঁড়ায়। আনন্দবাজারের রিপোর্টিংয়ে ঢুকেই অশোক মজুমদারের সঙ্গে জলদাপাড়ায় বন্যার রিপোর্টিং করতে গেছিলাম। জঙ্গলের প্রেমে পড়া সেই থেকে শুরু।

সুন্দরবনের জঙ্গলের ভেতরেও প্রথম ঢুকেছি আনন্দবাজারে চাকরির সূত্রে। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের হাল-হকিকতের সঙ্গে, সুখ-দুঃখের সঙ্গে, সুন্দরবনের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় আশির দশকের গোড়ায়। সূত্র অবশ্যই ফুটবল। খেলা ও খেলানো। সেসময় ছোট মোল্লাখালি, বালি এক নম্বর, মৌখালি, সাতজেলিয়া, রাঙাবেলিয়া বা বাসন্তীতে চিংড়ি মাছের "ভকাম," ডাল, আর আলু চোখা দিয়ে সপাসপ ভাত মেখে খেতাম। আলু, কুমড়োর পাতলা ঝোল, তরকারি। সঙ্গে চিংড়ির মাথা। ঠেসে কাঁচা লঙ্কা দেওয়া। সেটার নামই চিংড়ি মাছের ভকাম।

বাসন্তীর ফেরিঘাটের কাছে মেজদার হোটেলে যার সঙ্গে এই খাওয়াটা প্রথম খেয়েছি, নামটা তার মুখেই শুনেছি, 'মেজদা একটু ভকাম দাও তো?' ব্রেকফাস্টে পেটাই পরোটা আর ঘুগনি। ঘুগনি তো নয়, জলের ওপরে গোটা গোটা মটর ভাসছে। রাতে মুরগীর মাংস আর ভাত। খেলায় জিতলে দু'টুকরো বেশি। হারলে আলু বেশি।

সল্টলেকের বিকাশভবনে বন দফতর উঠে যাওয়ার পরে (তখনও "অরণ্য ভবন" তৈরির কাজ শুরু হয়নি) অশোক মজুমদারের সূত্রেই আমার সেখানে প্রথম প্রথম যাওয়া। অশোক আমাকে নিয়ে গেছিল বন দফতরের শিকারী সুব্রত পাল চৌধুরীর কাছে। সুব্রতই বন দফতরে আমার প্রথম বন্ধু। এর আগে জঙ্গল, বাঘ, হরিণ, হাতি নিয়ে যা খবর করেছি সব কিছুর উৎস মহাকরণ। বনমন্ত্রী অম্বরীশ মুখার্জি, অচিন্ত্য রায় (পুনশ্চ-১ দেখুন) কিংবা বন প্রতিমন্ত্রী বনমালী রায়ের বিবৃতি। বিকাশ ভবনে সুব্রতর কাছে গিয়ে নানা গল্প শুনে আমার উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল।

একদিন সুব্রতর ওখানে গিয়ে দেখি ও নেই। কোথায় যাই, কোথায় যাই? ঘুরতে ঘুরতে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের ঘরের সামনে চলে এলাম। তিনিই এই অফিসের সর্বময় কর্তা। দরজায় বড়বড় করে লেখা "সুবিমল রায়, আইএফএস"।

বাইরে কাউকে না পেয়ে সুদেবদার শেখানো স্টাইলে (পুনশ্চ -২ দেখুন) দরজা খুলে মুখটা বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, 'অপরাধ নেবেন না। না বলেই চলে এসেছি। আপনার নাম এত শুনেছি যে নেমপ্লেটে নাম দেখে কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। জানি আপনি আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করে দেবেন।'

ততক্ষণে এক পা-দু'পা করে ঘরের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছি। মাথায় অল্প চুল, কালো ভদ্রলোককে মহাকরণে বনমন্ত্রীর ঘরে দেখেছি। থেমে থেমে কথা বলেন। বললাম, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই শুনে সেদিন মন্ত্রীমশাই আমাকে বকাবকি করলেন। বাঘের খবর খুঁজছি কিন্তু আপনাকেই চিনি না! '

উনি আমাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। 'কি জানতে চান বলুন," চশমার ফাঁক দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। আমি তো প্রশ্ন তৈরি করে আসিনি। ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সেটাই তো ভাবিনি। দেখলাম বাঘের পায়ের ছাপের বেশ কয়েকটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো। সেই সময়টায় বাঘ গণনা বা বাঘ-শুমারি শুরু হয়েছে সুন্দরবনে। যে পদ্ধতিতে বাঘ গোনা হচ্ছে তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমি হাতে চাঁদ পেলাম। সুবিমলবাবুই গোটা প্রক্রিয়ার সর্বাধিনায়ক। তাই সব ধন্দ মেটানোর এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

সুবিমলবাবু বিরক্ত তো হলেনই না। বরং শিক্ষকের মতো কাগজে আঁকিবুকি কেটে বোঝালেন। কী

ভাবে ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা হচ্ছে তাও জানালেন। বুঝে গেলাম প্রথম পাতার খবর কেউ আটকাতে পারবে না। হলও তাই। সুবিমলবাবুর ঘরের দরজা আমার কাছে বরাবরের জন্যে খুলে গেল।

বস্তুতপক্ষে সুবিমলবাবুর ঘরেই আমার সঙ্গে অতনু রাহার আলাপ। জঙ্গলে গিয়ে আমাকে ভালো ওয়াইল্ডলাইফ রিপোর্টার বানানোর দায়িত্ব অনুজের হাতেই ছেড়ে দিলেন অগ্রজ। শুধু সুন্দরবনই নয়, ওই জঙ্গলের সঙ্গে ডুয়ার্সের জঙ্গলের কি পার্থক্য, উত্তরবঙ্গের বক্সা ও সুন্দরবনের বাঘের মধ্যে আকৃতিগত বা চরিত্রগত তফাৎ কি এসবই অতনুবাবুর কাছ থেকে শেখা।

একবার অফিসে গল্প করছিলাম সুন্দরবনের বাঘের মানুষখেকো বদনাম নিয়ে। আমাকে রবিবাসরীয়র জন্যে লিখতে বলা হল। রবিবাসরীয়তে আমার প্রথম নিবন্ধ সুন্দরবনের বাঘের স্বভাব নিয়ে। সৌজন্যে অতনু রাহা। কিন্তু আমার মন্দ কপাল। কুড়ি বারেরও বেশি সুন্দরবনে গিয়ে একবারও দক্ষিণ রায়ের দেখা পাইনি।

ঢক্কানিনাদ ও নীরবতাঃ

দুজনের কেউই সরাসরি আমার শিক্ষক ছিলেননা। আমার বিষয়ের লোকও নন। একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্স বিভাগের স্রষ্টা অমলেশ চৌধুরী। অন্যজন সুন্দরবনের 'মনের মানুষ' রাঙাবেলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষার কাঞ্জিলাল।

অমলেশবাবু বলতেন, ১৯৯৯ সালের সুপার সাইক্লোন থেকে ওড়িশা যে শিক্ষা নিয়েছিল, তখনই পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে ২০০৯ সালের আয়লায় এত জীবনহানি ঘটত না। এত চাষের জমি বন্ধা হয়ে যেত না।

আয়লার ধ্বংসলীলাও যে আমাদের চোখ খুলে দিতে পারেনি, তা আমরা বুঝেছি ২০২০ সালের আমফানের সময়ে। দেখেছি সুন্দরবনে নদীবাঁধ মেরামতির কাজ কতটা দায়সারা ভাবে করা হয়েছে।

অমলেশবাবুই নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুলে ধরে বলেছিলেন, শুধু সুপার সাইক্লোন - সিডার বা আয়লা - নয়, বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সমুদ্রের উষ্ণতা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে এমন ঘূর্ণিঝড় দুর্লভ তো নয়ই, বরং বছরে দুটো করে হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অর্থাৎ একটা ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সামলাতে না-সামলাতেই আরেকটা প্রবল ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে নতুন নতুন এলাকা চলে যেতে পারে সমুদ্র গর্ভে। সুন্দরবনের মানুষ বিপদগ্রস্ত হতে পারেন। অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে যাবতীয় কর্মকাণ্ড।

আবার মাস্টারমশাই তুষার কাঞ্জিলাল বলতেন, বাঁধের নির্মাণ, তার নিয়মিত ভাঙন, ত্রাণ বন্টন, কাজের খোঁজে সুন্দরবনের বিপন্ন পুরুষ-মহিলার নিয়মিত ভিন রাজ্যে 'পাচার' হয়ে যাওয়াটাও বোধহয় সুন্দরবনের স্বাভাবিক জীবনচক্র হয়ে যাবে। এই অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুঘটকের কাজ করে। মানুষ বিপন্ন হন, পাচারকারীরা ওর পেতে থাকেন আর রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেরই 'লক্ষ্মীলাভ' হয়।

কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। ওড়িশার সুপার সাইক্লোনের এক-দেড় বছরের মাথায় ছিল নির্বাচন। সেই নির্বাচনের প্রিভিউ লিখতে ঘুরে বেড়িয়েছি কেন্দ্রাপাড়া, পারাদ্বীপের সেই সব এলাকা, যেগুলি ওই মারাত্মক ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব অঞ্চলে ২-৩ কিলোমিটার অন্তর অন্তর তৈরি হয়েছে সাইক্লোন শেল্টার। বড় বড় পিলারের উপর তৈরি বিশেষ ধরনের বাড়ি যেখানে সাধারণ সময় প্রাইমারি স্কুল চলে, তবে ঝড়ের পূর্বাভাস থাকলেই সেখানে উঠে আসে পুরো গ্রাম আর শুরু হয়ে যায় রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া; পুরোটাই সরকারি খরচে আর ব্যবস্থাপনায় থাকে পঞ্চায়েত।

ওড়িশার মত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকাও অনেকটা বিস্তৃত। তখন পশ্চিমবঙ্গকেও এই ওড়িশা মডেল অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার বোধহয় ২০০৯ সালের প্রবল ঘূর্ণিঝড় আয়লার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তবে ২০০৮ সালের অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় সিডার যদি সাগরদ্বীপের কান ঘেঁষে বেরিয়ে, বাংলাদেশের উপরে আছড়ে না পড়ে ভারতীয় সুন্দরবনের উপরে আছড়ে পড়ত তাহলে মহা বিপর্যয় ঘটত।

সিডার বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সুন্দরবনের সেই চেহারা আমি দেখে এসেছি। সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ এলাকার ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে কচুকাটা করে ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগের ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বরিশাল ও খুলনা জেলার উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল ঘরবাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে আসার পথে মাথায় গাছ পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বনের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

তবে যেখানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের চওড়া ঢাল ছিল, বেঁচে গিয়েছিল সেই সব গ্রাম। ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া গ্রামগুলির মানুষ আশ্রয় পেয়েছিলেন ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের রক্ষাকবচ থাকা গ্রামগুলিতে।

ফিরে এসে লিখেছিলাম ঘূর্ণিঝড় ঠেকাতে ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গলের উপকারিতার কথা। লিখেছিলাম ওড়িশা মডেলের সাইক্লোন শেল্টার থাকলে বাংলাদেশে এত মানুষের প্রাণহানি ঘটত না। এক বছর পরে আয়লা এসে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমরা কতটা অসহায়। কতটা প্রস্তুতিহীন।

ওড়িশায় বিশ্বব্যাঙ্কের ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) প্রকল্পের টাকায় সাইক্লোন সেন্টার তৈরি হয়েছে। সেই প্রকল্প আয়লার পরে এ রাজ্যেও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সাইক্লোন সেন্টার চোখে খুব একটা কমই পড়ে। এক আমলাকে একবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি রবি ঠাকুরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমরা আড়ম্বর করিয়া শুরু করি কিন্তু শেষ করিতে পারিনা।' অর্থাৎ প্রকল্প শেষ না করাটা নাকি আমাদের জিনের দোষ।

একটি লেখায় পড়েছিলাম, 'সরকারি পয়সায় এলাহি খাওয়া-দাওয়া আর বেড়ানো ছাড়া বিশেষ কিছু হয়নি। আইসিজেডএমপি প্রকল্পে আমাদের রাজ্যের ফলাফল যে সবচেয়ে খারাপ হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

গত পঞ্চাশ বছরে সুন্দরবনে যত বড় বড় ঝড় হয়েছে তার বেশির ভাগটাই গেছে বাংলাদেশে। তবে তার মধ্যে সুপার সাইক্লোন সিডার আর আয়লা ছিল ভয়াবহ।

সরকারি তথ্য বলছে, নদীতে জোয়ার থাকায় আয়লায় ভারতীয় সুন্দরবনের ৭৭৮ কিমি নদী বাঁধ ভেঙ্গে যায়। হু হু করে জোয়ারের জল ঢুকে সব চাষের জমি ও মিষ্টি জলের পুকুর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৃষিযোগ্য জমি নষ্ট হয়, মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম সঙ্কট। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শেষ হতে না হতে দাবি ওঠে, এইভাবে চলবে না, নদী বাঁধের পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তুষার কাঞ্জিলালের কথা বের মনে পড়ছে। গোসাবা নদী দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাঙাবেলিয়া দ্বীপের একাংশের ভাঙন দেখতে দেখতে মাস্টার মশাই বলতেন, 'সুন্দরবনের নদী বাঁধ বাঁচানোর জন্য প্রকল্প তো সেই বিধান রায়ের আমল থেকেই হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন। সবিস্তার রিপোর্টও জমা পড়েছিল। আড়ম্বর করে শুরু করা প্রকল্প কেন যে সূর্যের মুখ দেখেনি তা আমিও জানিনা।'

সুন্দরবনের নদীবাঁধের ইতিহাস খুব একটা পুরনো কিন্তু নয়। আড়াই'শ বছরেরও কম। একটি লেখায় পড়েছিলাম, বৃটিশরা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বসতি গড়ে তোলার জন্য ইজারা দেয়।

উপসংহারঃ

ছোটবেলায় আমরা সুন্দরবন বলতে বুঝতাম, জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। এখন বাঘ এবং কুমীর দুজনকেই সঙ্কটে ফেলেছে জলে ভাঙন আর আকাশে ঝড়। আর তার মূলে বিশ্ব উষ্ণায়ন।

সুন্দরবনের ব-দ্বীপে ঘোড়ামারা সহ অনেক দ্বীপই এখন বিপন্ন। ঘোড়ামারার মতো অনেক দ্বীপই উঁচু হয়ে আসা সমুদ্রের নোনা জলের রোষে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আসলে বঙ্গোপসাগরের জলস্তর ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই সাগরে জলের মাত্রা বাড়ছে, বঙ্গোপসাগরও তার ব্যতিক্রম নয়।

ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ আইপিসিসি-র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে জলস্তর প্রতি বছর ৩.৬ মিলিমিটার হারে উঠছে। কিন্তু এইটুকু বললেই সুন্দরবনের বিপদটা ঠিকমতো বোঝানো যাবে না।

পাশাপাশি আর একটা প্রক্রিয়াও চলছে প্রায় একই গতিতে। প্রতি বছর গড়ে ২.৯ মিলিমিটার করে বসে যাচ্ছে সুন্দরবনের মাটি। অর্থাৎ প্রতি বছর ৬.৫ মিলিমিটার করে উঁচু হয়ে উঠছে সাগরের জলস্তর। ফলে, সাগরতল উঁচু হয়ে ওঠার প্রভাব অন্য নানা জায়গায় যতটা, সুন্দরবনে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গের অংশটায় যেখানে ব্রিটিশ আমল থেকেই জঙ্গল কেটে সাফ করে জনবসতি তৈরি শুরু, সেখানে ভূমিক্ষয়ের মাত্রা অনেক বেশি। সেখানেই বিপদ বেশি। ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলায় মাটির বাঁধন আলগা হয়েছে। সমুদ্রের দরজা খুলে গিয়েছে। ক্রমাগত এগিয়ে আসছে সমুদ্র।

১৯১৭ সাল থেকে এক'শ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্র উপকূল থেকে অন্তত ৪০০ বর্গ কিলোমিটার জমি গিলে নিয়েছে। তার জলস্তর বাড়তে থাকায় বিপদের শঙ্কা আরও বেড়েছে।

জলস্তর বাড়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ঘূর্ণিঝড়। প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ছে এই এলাকা। আর সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়গুলি সব ক'টিই অতি প্রবল।

সমুদ্রের জলস্তরের গড় উষ্ণতা পৃথিবী জুড়েই বাড়ছে। আর বঙ্গোপসাগরে এই উষ্ণায়নের মাত্রা অনেকটা বেশি। প্রতি দশ বছরে গড়ে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়ছে সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্রের জলের উষ্ণতা। তাতেই বাড়ছে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির প্রবণতাও।

--গত ১০ বছরে সিডার, আয়লা, ফনী, বুলবুল, হুদহুদ, আমফান, ইয়াস কেউ কারোর থেকে কম যায় না। আবহ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় তৈরির হার কিন্তু বাড়তেই থাকবে।

অতঃ কিম্ঃ

বঙ্গোপসাগরের যে জায়গায় ২০২০ সালে তৈরি আমফানের ভ্রূণ দেখা গিয়েছিল সেখানে মাঝে মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের বীজ বপন হয়। মাঝে মাঝেই বাংলাদেশ উপকূলে তৈরি হওয়া উচ্চচাপ বলয় সেই অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়কে এগোতে দেয়না সুন্দরবনের দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে ওড়িশা কিংবা বাংলাদেশে।

কিন্তু বার বার ওই ধরনের কোনও উচ্চচাপ বলয় যে বাংলাদেশ উপকূলে তৈরি হবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। যদি এখনও আমরা সতর্ক না হই, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে না পারি, ম্যানগ্রোভের ধ্বংস আটকাতে না পারি, একদিন আমফানের থেকেও শক্তিশালী কোনও ঝড় ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের সাধের কলকাতাকেও।

ধ্বংস হওয়া ইউরোপীয় শহর পম্পেইয়ের পাশে কোনদিন লেখা হতে পারে কলকাতার নামও!

বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও পরিবেশবিদ
সদস্য, সাংগঠনিক কমিটি, ইসনা

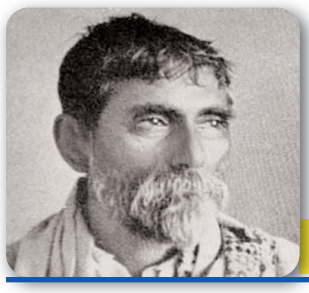

বিজ্ঞান কহন

কলকাতা, এপ্রিল ২২, ২০২৬, বুধবার, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

এল নিনোর ছায়া

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র :
ছাত্রী (মেঘলা)
স্কুল শিক্ষিকা (দেবলীনা ম্যাডাম)
এসএফএক্স : নরম বাতাস, জানালার পর্দা নড়ার শব্দ। দূরে পাখির ডাক।
ছাত্রী (মনে মনে): বিকেলের আলোটা আজ কি রকম যেন নরম নরম জানালার ফাঁক গলে আলোটা ঠিক ল্যাপটপের স্ক্রিনে এসে পড়েছে। (একটু থেমে)
El Niño…
এসএফএক্স : কিবোর্ডে হালকা টাইপ করার শব্দ।
ছাত্রী (ধীরে ধীরে পড়তে থাকে): "প্রশান্ত মহাসাগরে লা নিনা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মে মাস থেকেই এল নিনোর ছায়া স্পষ্ট হবে।
এসএফএক্স : দরজায় হালকা টোকা।
শিক্ষিকা: মেঘলা ভিতরে আসতে পারি?
ছাত্রী: হ্যাঁ ম্যাডাম আসুন।
এসএফএক্স : দরজা খোলার শব্দ, চেয়ার টানার শব্দ।
শিক্ষিকা (মৃদু হেসে): একা বসে এত মন দিয়ে কি পড়ছ?
ছাত্রী: ম্যাডাম আমাদের কলেজ রেডিওর জন্য একটা খবরের খসড়া তৈরি করছি। এল নিনো নিয়ে।
শিক্ষিকা: এল নিনো?
ছাত্রী (নিচু গলায়): হ্যাঁ।
কিন্তু ম্যাডাম এটা শুধু আবহাওয়ার নাম না। এই নামটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের মাঠ, শুকনো খাল... আর বাবার মুখটা।
শিক্ষিকা (আলতো স্বরে): তোমার বাবা তো চাষি, তাই না?
ছাত্রী: হ্যাঁ ম্যাডাম।
প্রতিবছর বর্ষা এলেই বাবা বলেন "বৃষ্টি ঠিকমতো নামলেই সব ঠিক হয়ে যায় মা।" (একটু থেমে)
কিন্তু এবার বাবার গলাটা কেমন বদলে গেছে। ধরা ধরা লাগছে।
শিক্ষিকা: খবরে কী বলছে?
ছাত্রী (পড়তে থাকে): ২০২৬ সালে এল নিনো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। বর্ষা দুর্বল হতে পারে।
ধান, ডাল সব কিছুর উৎপাদনের ওপরেই এর প্রভাব পড়তে পারে।
শিক্ষিকা (দীর্ঘশ্বাস): হ্যাঁ প্রকৃতির এই বদলটা খুব ভয় ধরায়।
ছাত্রী: ম্যাডাম এখানে আরও লেখা আছে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি কম হতে পারে। গরম বাড়বে। তাপ-প্রবাহ দীর্ঘ হবে। এমনকি মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গে তাপমাত্রা ছুঁতে পারে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এসএফএক্স : হালকা বাতাসের শব্দ হঠাৎ থেমে যায়।
শিক্ষিকা (গম্ভীর কণ্ঠে): গত বছরটার কথা মনে আছে, মেঘলা?
ছাত্রী: খুব মনে আছে ম্যাডাম।
এসএফএক্স : হালকা রাস্তাঘাটের শব্দ, দূরে গাড়ির হর্ন।
ছাত্রী (স্মৃতিতে ডুবে): এপ্রিল মাসে স্কুল থেকে ফেরার সময়
এক বৃদ্ধ চা-দোকানি ছাতার নিচে বসে হাঁপাচ্ছিলেন।
একটা কুকুর ফুটপাতে ছায়া খুঁজে গা এলিয়ে দিয়েছিল।
আর বাতাসে একটুও ঠান্ডা ছিল না, ম্যাডাম।
এসএফএক্স : ধীরে ধীরে রাস্তাঘাটের শব্দ মিলিয়ে যায়।
শিক্ষিকা: এই এল নিনোর বছরগুলোতেই শুধু গরম বাড়ে। তাই তো?
ছাত্রী: হ্যাঁ ম্যাডাম মানুষের দুশ্চিন্তাও বাড়ে।
শিক্ষিকা: আর কী বলছে রিপোর্ট?
ছাত্রী (ধীরে পড়তে থাকে): ২০২৬ সাল নাকি ইতিহাসের অন্যতম উষ্ণ বছর হতে চলেছে।
পুরনো সময়ের গড় তাপমাত্রার চেয়েও

অনেক বেশি গরম থাকবে পৃথিবী।
এসএফএক্স : জানালার বাইরে পাখির ডাক।
শিক্ষিকা (জানালার দিকে তাকিয়ে): দেখো, আকাশটা কত শান্ত
কিন্তু শান্ত আকাশের নীচেই তো সবচেয়ে বড় বিপদ লুকিয়ে থাকে অনেক সময়।
এসএফএক্স : মোবাইল মেসেজ টোন।
ছাত্রী (হালকা চমকে): ম্যাডাম বাবার মেসেজ।
শিক্ষিকা: কী লিখেছেন?
ছাত্রী (পড়ে শোনায়):
"এবার বৃষ্টি ঠিকঠাক হবে তো?"
এসএফএক্স : কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।
শিক্ষিকা (আলতো করে): তুমি কী উত্তর দেবে?
ছাত্রী (কিছুক্ষণ থেমে):
জানি না ম্যাডাম কী লিখব ভাবতেই পারছি না।
(তারপর ধীরে) লিখছি
এসএফএক্স : কিবোর্ডে ধীরে টাইপ।
ছাত্রী (পড়ে): "সবাই বলছে, বর্ষা একটু দুর্বল হতে পারে বাবা।

কিন্তু আমরা চেষ্টা ছাড়ব না।"
শিক্ষিকা (নরম গলায়):
এই কথাটাই সবচেয়ে দরকার এখন।
এসএফএক্স : স্টুডিও মাইক্রোফোন অন হওয়ার হালকা 'বিপ'।
ছাত্রী: ম্যাডাম আমি রেকর্ড করব এখন।
শিক্ষিকা: কর। তোমার কণ্ঠটাই আজ অনেক মানুষের কথা বলবে।
ছাত্রী (মাইক্রোফোনে, স্পষ্ট কণ্ঠে):
২০২৬ সাল শুধু একটি ক্যালেন্ডারের সংখ্যা নয়।
এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তা।
এল নিনো আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কটা বদলাচ্ছে।
আর সেই বদলের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের কৃষক, আমাদের শহর,
আর আমাদের আগামী প্রজন্ম।
এসএফএক্স : রেকর্ড বন্ধ হওয়ার শব্দ।
ছাত্রী (হালকা নিঃশ্বাস ফেলে):
ম্যাডাম
মনে হচ্ছে এই গল্পটা শুধু আবহাওয়ার না।
শিক্ষিকা (ধীরে, আশার সুরে):
হ্যাঁ মেঘলা
এটা মানুষের লড়াইয়ের গল্প।
খরার মাঝেও বাঁচার চেষ্টা করার গল্প।
আর আগুনের মতো গরমের ভেতরেও এক ফোঁটা বৃষ্টির অপেক্ষার গল্প।
এসএফএক্স : দূরে খুব হালকা বজ্রধ্বনি, তারপর নরম বাতাস।
ছাত্রী (শেষ সংলাপ, নরম কণ্ঠে):
হয়তো
এই অপেক্ষাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

যুগ্ম সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন

বিড়লা সংগ্রহশালায় পূর্ব ভারত বিজ্ঞান মেলা
ছবি: সৈকত কুমার বসু, প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

বই পর্যালোচনা : মহাবিশ্বের বিস্ময়-দুই মলাটে বন্দী

রাজ্যেশ্বর সাহা

বিজ্ঞানকে সহজ, আকর্ষণীয় এবং ভাবনা জাগ্রত করে তোলার এক অনন্য প্রচেষ্টা দেখা গেলো সম্প্রতি প্রকাশিত লেখক তুহিন সাজ্জাদ সেখের " কোষ থেকে কসমস: মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্ময় " - এই বইটির মধ্যে। বইটি পাঠককে এক বিশাল যাত্রার আহ্বান জানায়, যেখানে ক্ষুদ্রতম কোষ থেকে শুরু করে অসীম মহাবিশ্ব পর্যন্ত বিস্ময়ের এক অবিরাম ধারা প্রবাহিত।

বইটির ভূমিকা থেকেই বোঝা যায়, এটি শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক কোনো পাঠ্য নয়; বরং কৌতূহল, অনুভব এবং বিজ্ঞানমনস্কতার এক সুন্দর সমন্বয়। লেখক অত্যন্ত সহজ ভাষায় এমন সব জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় তুলে ধরেছেন, যা সাধারণ পাঠকও সহজে বুঝতে পারে। বিজ্ঞানকে ল্যাবরেটরির গণ্ডি থেকে বের করে এনে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সূচিপত্রে নজর দিলে বোঝা যায়, বইটি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। জীবনের উৎপত্তি, পৃথিবীর সৃষ্টি, কোষের রহস্য, মহাসাগরের অজানা দিক, মহাকাশের বিস্ময়, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি , এমনকি ভিনগ্রহের সম্ভাবনাও এখানে আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় যেন এক একটি নতুন দরজা, যা পাঠককে অজানার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

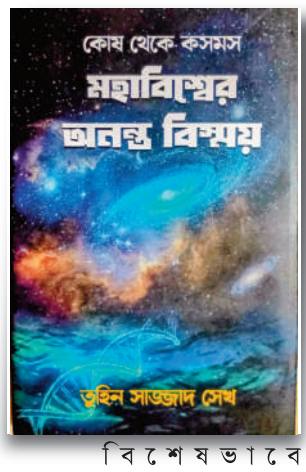

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, লেখক বিজ্ঞানকে কেবল তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করেননি; বরং সাহিত্যিক আবহে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ফলে পাঠকের মনে কেবল জ্ঞানই সঞ্চারিত হয় না, পাশাপাশি জাগে বিস্ময়, প্রশ্ন করার সাহস এবং জানার আনন্দ।

বইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি তরুণ পাঠকদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম। সহজ ভাষা, জীবন্ত বর্ণনা এবং চিন্তাকে উদ্দীপিত করার ক্ষমতা এই বইটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

বইটির, অন্বেষণ প্রকাশনা বইটির লেখার মানের পাশাপাশি অন্যদিকে ও গুরুত্ব দিয়েছে। বাঁধাই ও ছাপার মান ভালো ।

প্রচ্ছদ ও মানানসই। বইটির দাম ও যথাযথ, পাঠকের সংগ্রহ করে রাখার মতো।

সব মিলিয়ে , "কোষ থেকে কসমস: মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্ময়" একটি মনন-শীল, শিক্ষামূলক এবং অনুপ্রেরণামূলক গ্রন্থ। যারা বিজ্ঞানকে ভালোবাসে, কিংবা নতুন করে বিজ্ঞানকে জানতে চায় তাদের জন্য এই বইটি নিঃসন্দেহে এক চমৎকার সঙ্গী।

কোস থেকে কসমস মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্ময় ।।
লেখক : তুহিন সাজ্জাদ শেখ ।।
প্রকাশক : অন্বেষণ পাবলিশার্স।।
প্রথম প্রকাশ : বই মেলা - ২০২৬ ।।
দাম : ৩৫০ টাকা।।

রাজ্যেশ্বর সাহা
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ বিবেকানন্দ কলেজ ,
ঠাকুপুকুর, ইমেইল : rajjyeswarsaha21@gmail.com
ফোন নং - ৯২৩০৪০৩২৬০

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: ড.অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: ড. সুকল্যাণ গাইন
বিশেষ প্রতিনিধি- সৈকত কুমার বসু এবং মালবিকা সেনগুপ্ত
কারিগরি উপদেষ্টা: তনুশ্রী দে
ফটো এডিটর- রাজ্যেশ্বর সাহা

সদস্য: প্রফেসর বিকাশ চক্রবর্তী, প্রফেসরসুধেন্দু মণ্ডল, প্রফেসর মানস চক্রবর্তী, প্রফেসর শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, প্রফেসর সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, ড. দেবপ্রসন্ন সিংহ, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, প্রফেসর প্রবীর কুমার সাহা, ড. টি. ভি ভেঙ্কটস্মরন, ড.স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী, ড.দেবদূত ঘোষঠাকুর, ইনা বসু, অর্পিতা চক্রবর্তী, অম্বালিকা রায়

সম্পাদনা-সহকারী
ড. এষা পণ্ডিত, ড. মুকুলিকা জানা চ্যাটার্জী, পরমাতাপসী মাইতি, শুভ্রা কুন্ডু, বেবী সরদার

৩৮ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেলঃ isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA